হিরণ্যগর্ভ
দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
৩০শে পৌষ, ১৪২৬

Hiranyagarbha
Volume 12, No. 4
हिरण्यगर्भ
द्वादश वर्ष, चतुर्थ संख्या
तारिख-१५,जनवरी,२०२०

৩০শে পৌষ, ১৪২৬ 15th January, 2020

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	ভগবান পরশুরাম	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	08
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	10
	ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	13
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	14
	নদী মাতৃকা গোদাবরী-কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	17
	শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা		18
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	19
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	20
	কোথায় তোমরা চলেছ?	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	22
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	24
	পঞ্চকেদারের পথে পথে	শ্রীসৌরভ বসু	25
हिन्दी विभाग ः—			
	भगवान परशुराम	श्रीमती ज्योति पारेख	28
	पंचकेदार के पथ पर	श्रीमती ज्योति पारेख	31
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	33
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	35
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	36
	भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य	श्रीमती ज्योति पारेख	38
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	39
	नदीमातृका गोदावरी कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	40
	मृत्यु के अतीत	श्रीमती ज्योति पारेख	42
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	43
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	44
	श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	45
English Section ঃ—			
	Bhagwan Parashurama - Immortal Avatar	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	47
	Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	52
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	54
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	56
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	58
	Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	59
	Annual Report of Mata Sharbani Trust (2018-19)		61

ISBN No. 978-81-940673-5-1

Cover : Bhagwan Parashuram

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 7961-8745, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

পৌষরাত্রির ঘন কুয়াশা যখন চরাচরকে আবৃত করে রাখে, শীতরাতের শিশিরবিন্দু যখন টুপটাপ করে ঝরে পড়ে গাছের পাতায়, ঘাসের মাথায়, তখন গীর্জায় গীর্জায় সুমধুর ঘন্টাধ্বনি বরণ করে নেয় ইংরেজী নববর্ষকে। প্রভু যীশুর স্মরণ প্রার্থনার মধ্যে আমরা শপথ গ্রহণ করি—নতুন বছরে নতুন উদ্দীপনা, সদ্ভাবনা ও সৎকর্মাদির শপথ।

ইংরেজী নতুন বছরের প্রথম মাসটিতেই সেই পুণ্যলগ্ন সমাগত যেদিন ভক্তি-বিনম্র চিত্তে আমরা পালন করি অখণ্ড মহাপীঠস্থ পুণ্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের অভিষেকের পুণ্যলগ্ন। সেই মহালগ্নে পূজাপাঠ - গুরু বন্দনায়, ধূপ-দীপ-পুষ্প সুগন্ধে, শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠুক পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গণ।

হিরণ্যগর্ভের এই পবিত্র সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করেছি অবতার বরিষ্ঠ পুরুষ ভগবান শ্রীপরশুরামের পবিত্র চরণে। ভগবৎস্বরূপের পথে বহু ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষিগণ অবতারত্ব গ্রহণপূর্বক ধরাতলে আবির্ভূত হয়েছেন - ভগবান পরশুরাম তাঁদের অন্যতম। তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণশক্তির বিকাশ - আবেশাবতার। ভগবান পরশুরাম জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ ধর্মাস্ত্রের বিকাশরূপ। তিনি প্রভু জগন্নাথের "বলরাম" শক্তির বিকাশ। ভগবান শঙ্করের বরে তিনি অমরপুরুষ। হিমালয়ের গহনে জ্ঞানগঞ্জে ভগবান পরশুরাম আজও মহান আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত।

হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক সংখ্যাটি সেই যোগীশ্বর, অমর, ব্রহ্মপুরুষের চরণে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম। আজ এই পুণ্যলগ্নে সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপ শ্রীশ্রীসর্বাণীমা ও সকল গুরু মহারাজগণের চরণে আমাদের বিনম্র প্রর্থনা—আমাদের মনের সকল কলুষতা বিনষ্ট হয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তন জাগরিত হউক।

"জয় জগদীশ হরে"

As the earth slumbers, enveloped in the blanket of mist, and dew drops keep falling imperceptibly on the leaves of trees and blades of grass, one can hear the jingling bells of the churches chiming in unison to usher in the New Year. It is the time when we invoke the blessings of the Lord every year to rejuvenate ourselves with renewed energy and take a vow to immerse ourselves in noble thoughts and deeds, transcending our mental shortcomings.

It is also the month when we prepare ourselves to celebrate with piety and verve the auspicious occasion of the enthronement of Guru Maharajas in our Ashram. We look forward to immerse ourselves in the spiritual bliss and offer our homage to Their golden feet to beseech their blessings and compassion in our spiritual pursuits.

We feel blessed to dedicate this edition of Hiranyagarbha in the divine memory of Bhagwan Parashurama, the great saint, the immortal persona, who has graced the world through the ages by his haloed presence. He is an Avesh-avatar, the divine manifestation of God Almighty, an incarnation of Lord Vishnu. In philosophical connotation, the word "Parashurama" means the "halo of spiritual attainment of the soul". Blessed by Lord Shiva to be an immortal, his divine presence can still be perceived in "Jnangunj", the ethereal Himalayan abode of saints and savants.

On the auspicious occasion of Poush Sankranti, let us pray to the lotus feet of Sree Sree Sharbani Maa and all Guru Maharajas to help us shed our mental imperfections on way to our spiritual journey in our life ahead.

****** Om Jai Jagadisha Harey ******

ভগবান পরশুরাম
শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গর্গসংহিতায় ভগবান বিষ্ণুর ছয় প্রকার অবতার কল্পিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ভগবানের অংশাংশাবতার; ব্রহ্মর্ষি দেবগণ অংশাবতার; কপিল, কূর্ম্ম প্রভৃতি কলাবতার এবং পরশুরাম আবেশাবতার। নৃসিংহ, দাশরথি রাম, নরনারায়ণ ইঁহারা পূর্ণাবতার আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতমাবতার। অবতার যেমনই হউক না কেন সকল অবতারের মধ্যেই শ্রীভগবানের পূর্ণ শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ থাকে। যোগমার্গে ভগবৎস্বরূপের পথে বহু ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি ঋষি ভগবৎনির্দেশে অবতারত্ব গ্রহণপূর্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আত্মজ্ঞানী সত্যদ্রষ্টা মহাত্মাগণেরা ইহা অবশ্যই অবগত থাকেন। ভগবান পরশুরাম সে সকল অবতারদিগের মধ্যে একটি বিশেষ অবতার চরিত্র।

ভগবান পরশুরাম

রাজা কুশনাভের পুত্র কুশিক এবং কুশিকের তপোলব্ধ দেবরাজ ইন্দ্রাংশে জাত পুত্র গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা ছিল। মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র ঋচীক। ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে গাধি বলিলেন — ''তপোধন! আমার পূর্বপুরুষ পরম্পরায় একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে আমরা কন্যাদান সময়ে অভ্যন্তর রক্ত, বহিঃ শ্যামবর্ণযুক্ত পাণ্ডুকলেবর চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট, একদিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ এবং তরস্বী সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমি আপনার নিকট শুল্ক চাহিতে পারিনা অথচ আপনার মত ব্যক্তিকে কন্যাদান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য।'' ঋচীক গাধির কথা শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণদেবের নিকট হইতে উপরোক্ত প্রকার অশ্বাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিনিময়ে সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। একদা মহাতেজস্বী ঋষি ভৃগু স্বীয় তনয় ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলে তখন পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। ইহাতে ভৃগু অতিশয় প্রীত হইয়া সত্যবতীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে সত্যবতী নিজের জন্য এবং নিজ জননীর জন্য পুত্র বর প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু তখন দুইপ্রকার চরু প্রদান করিয়া বলিলেন —''তুমি উডুম্বর ও তোমার জননী অশ্বত্থবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া এই চরুদ্বয় ভক্ষণ করিবে।'' পরন্তু সত্যবতী ও তাহার মাতা বৃক্ষালিঙ্গন ও চরুভক্ষণে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিলেন। মহর্ষি ভৃগু যোগবলে ইহা জানিতে পারিয়া তখন বলিলেন — ''যেহেতু তোমরা চরুভক্ষণ ও বৃক্ষালিঙ্গনে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়াছ, সেই কারণে তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন এক পুত্র জন্মিবে।'' একথা শুনিয়া তখন সত্যবতী বিনয়পূর্বক বলিলেন— ''ভগবন্! আমার যেন এইরূপ পুত্র না হয় বরং এই লক্ষণ সম্পন্ন পৌত্র জন্মে ইহাতে ক্ষতি নাই।'' তখন ভৃগু ''তথাস্তু'' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। জমদগ্নি বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিবার পরে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলে রাজা প্রসেনজিৎ যথাসময়ে শুভলগ্নে জমদগ্নির সহিত রেণুকার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। ইহার পরে রেণুকা হইতে রুমন্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন।

'পরশু' হল ধর্মযজ্ঞের অস্ত্র কুঠার, 'রাম' হইলেন আত্মা-নারায়ণ। আত্মযজ্ঞই প্রকৃত ধর্মযজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞের যজ্ঞাগ্নি সত্তার সকল কলুষ নাশ করিয়া থাকে। কুঠার দ্বারা যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ হয়, তাই কুঠার অতি পবিত্র অস্ত্র। আত্মচৈতন্যের চিদগ্নিই হইল জ্ঞানাগ্নি, যাহার দ্বারা সনাতন সত্য উদ্ভাসিত হয়। তাই পরশুরাম হইলেন জ্ঞানাগ্নি স্বরূপ ধর্মাস্ত্র বিশেষ। ভাগবতের মতে ভগবান পরশুরাম শ্রীনারায়ণের যোড়শ অবতার। আত্মজ্ঞানের মহিমায় ভগবান পরশুরাম হইলেন,

ভগবান সনৎকুমারের 'জগন্নাথ' পদে অধিষ্ঠিত রূপের 'বলরাম' শক্তির রূপ, ঋষিত্বের ভগবত্বার প্রকাশরূপ। তাই তিনি আবেশাবতার।

কোন এক সময় মহর্ষি জমদগ্নির পুত্রগণ ফলাদি আহরণ করিবার জন্যে বনে গেলেন এবং তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই সময়ে নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিয়া নদীতীরের পথ দিয়া ফিরিবার কালে মাতা রেণুকা নদীতে পত্নীর সঙ্গে জলক্রীড়ারত মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখিতে পাইলেন। পরমসুন্দর রাজা চিত্ররথকে দেখিয়া রেণুকা মুগ্ধ হইলেন এবং রাজার প্রতি আসক্ত হইলেন। রাজার কথা চিন্তা করিতে করিতেই রেণুকা আশ্রমে ফিরিলেন, কিন্তু মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ফেলিলেন এবং অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এই সময় চার পুত্রের সকলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে পর জমদগ্নি পুত্রদের মাতৃবধে প্রণোদিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু মাতার প্রতি স্নেহবশতঃ জমদগ্নির চার পুত্রই মাতাকে বধ করিতে অস্বীকার করিলেন। পুত্রেরা তাঁহার আদেশ পালনে অসমর্থ হইলে পরে মহর্ষি তাহাদের অভিশাপ দিলেন। ইহার পর কনিষ্ঠ পুত্র রাম আশ্রমে ফিরিলে পরে জমদগ্নি অন্যান্য পুত্রদিগের মত রামকেও সব কথা বলিলেন এবং মাতাকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। পিতার আদেশ শুনিবামাত্রই তখন পরশুরাম কুঠারের আঘাতে মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন। তখন জমদগ্নির উগ্রক্রোধ প্রশমিত হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া তখন রামকে বলিলেন —''তুমি আমার আদেশে অতি দুষ্কর এই কর্ম করিয়াছ। অতএব তুমি যতগুলি ইচ্ছা ততগুলি বর প্রার্থনা কর।'' পরশুরাম তখন সদ্‌গুরু পিতার নিকট মাতার পুনরায় জীবনলাভ, মাতার মাতৃহত্যার ঘটনা বিস্মৃত হওয়া, মাতৃহত্যার পাপ হইতে মুক্তি, ভ্রাতাদের শাপমুক্তি, যুদ্ধে নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং দীর্ঘায়ু — এই সকল বর প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি জমদগ্নি তখন প্রসন্নচিত্তে এই সকল বর পরশুরামকে প্রদান করিলেন। — অবতার স্বরূপ ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জন্মান্তরীন তপস্যার দিব্যবল পরশুরামের ব্যক্তিসত্তায় গ্রথিত থাকায় তিনি মায়ামুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন এবং একদিকে পিতা এবং 'সদ্‌গুরু'-পিতার প্রতি সহজাত 'অটল বিশ্বাস' থাকার দরুণ তিনি পিতার আদেশকেই শিরোধার্য্য করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। সদ্‌গুরুর কর্মকে বিচার করিতে হয় না। যিনি বিশ্বাসে উপনীত আছেন তিনিই সদ্‌গুরুতে নিত্যযুক্ত আছেন। সদ্‌গুরুর প্রসন্নতায় অসাধ্যসাধনও সম্ভব হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই যে পরবর্তীতে মাতা রেণুকা পুনঃ শুদ্ধচিত্তে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন এবং পরশুরামের ভ্রাতাগণও পুনর্জীবনলাভ করিয়া তাহাদের পরবর্তী যোগজীবন সার্থক করেন।

ইহার পর মাতৃবধরূপ পাপ মোচনের জন্যে পিতৃউপদেশে পরশুরাম উত্তরে কৈলাস ও দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে ব্রহ্মপুত্র নামক মহাকুণ্ডে স্নান ও তপস্যা করিতে যান। তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিয়া পরশুরাম লোকহিতাভিলাষে স্বীয় পরশু-সাহায্যে উপযুক্ত পথ করিয়া ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে সমতলে অবতরিত করেন।

ইহার পর একদা হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জুন মৃগয়ার্থ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তাঁহার কামধেনুর সহায়তায় রাজা ও রাজন্যবর্গের যথাযথ সৎকার করিলে কামধেনুর আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে রাজা প্রলোভিত হইয়া হোমধেনু (কামধেনু কপিলা) হরণ ও বৃক্ষচ্ছেদন দ্বারা আশ্রম শ্রীহীন করতঃ জমদগ্নির উপর অত্যাচার করিয়া বৎসসহ গাভীটিকে তাঁহার রাজধানী মাহীষ্মতী পুরীতে লইয়া গেলেন। জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পিতার মুখে রাজার দুরাচারের কথা শ্রবণ ও আশ্রমের শ্রীহীন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। তদনন্তর কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা পরশুরামের অনুপস্থিতির সময়ে একদিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে একাকী দেখিতে পাইয়া নিরস্ত্র তপস্বীকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া সংহার করেন। পরশুরাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে মৃত দর্শন করিয়া ও সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পর পিতার অন্ত্যেষ্টি সমাপনান্তে মাহীষ্মতীর রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্য-তনয়গণের সংহারসাধন করিলেন। তৎপরে তাহাদের অনুগত ক্ষত্রিয়গণকে একে একে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইভাবে পরশুরাম পৃথ্বীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সামন্তপঞ্চক তীর্থে রুধিরময় পঞ্চতীর্থ নির্মাণপূর্বক পিতৃলোকে তর্পণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র পৃথিবী মহর্ষি কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং কশ্যপেরই নির্দেশে তিনি পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বসবাস করিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে ভগবান পরশুরামের

অন্যায়ের প্রতিবাদে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রূপটি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ প্রায় সকলেই অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। রামায়ণে আছে, ভগবান পরশুরাম শ্রীহরির কবচধারণপূর্বক যে বৈষ্ণব ধনুতে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলেন, সেই ধনুকটি তিনি পিতা জমদগ্নির নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। পিতা জমদগ্নির মত পরশুরামও ধনুর্বিদ্যায় সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ছিলেন। পরশুরাম শ্রীভগবান নারায়ণের ষোড়শ অবতার, ইহাই ভাগবতের মত। শ্রীভগবানের অন্যতম স্বরূপ কবি জয়দেব লিখিয়াছেন, ''ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং। কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।।''—অর্থাৎ, হে পরশুরাম রূপধারিন্! একদিন তুমি ক্ষত্রিয় রুধির রূপ জলে জগৎকে স্নান করাইয়া ইহাকে নিষ্পাপ ও তাপশূন্য করিয়াছিলে। হে কেশব! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও।। —(ইতি জয়দেব কৃত 'দশাবতার স্তোত্রম্')

পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার পরে ভগবান পরশুরাম তাঁহার শিবগুরু শিব ও শিবার এবং গুণে নারায়ণতুল্য সেই গুরুপুত্র কার্ত্তিক ও গণেশকে দর্শন করিবার অভিলাষে কৈলাসে গমন করেন। সেই সময় পার্বতীপুত্র গণেশ দ্বার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহাদেব নিদ্রিত থাকায় তিনি পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দেওয়ায় অতিক্রুদ্ধ পরশুরাম শিবদত্ত পরশুর দ্বারা গণেশকে আঘাত করিলে পর গণেশের একটি দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়। ভগবান পরশুরাম ও শ্রীকৃষ্ণ রূপ গণেশের যুদ্ধ ও দন্তভঙ্গ একটি ঈশ্বরীয় লীলা। সেই লীলামধ্যে পরব্রহ্মস্বরূপ গণেশের 'একদন্ত' নামরূপ সার্থক হইয়াছে। 'এক' শব্দের অর্থ প্রধান এবং 'দন্ত' শব্দের অর্থ বল, অতএব সর্বাপেক্ষা প্রধান যোগসিদ্ধি বল সম্পন্ন যিনি তাঁকেই 'একদন্ত' উপাধি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীগণেশ যুদ্ধকালে পরশুরামকে তাঁহার পিতা মহাদেবের অতিপ্রিয় শিষ্য জানিয়া প্রহার না করিয়া স্তম্ভন পূর্বক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এমনকি নিত্যধাম গোলক বৈকুণ্ঠাদি লোকও দর্শন করান এবং পরশুরামকে সনাতন সগুণব্রহ্মদেহী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকেও দর্শন করান। অতএব পরশুরামের সকল কর্মফল বিনাশ হইয়া যায়। মহাদেবের প্রদত্ত পরশু অস্ত্রই পরশুরামের মহা-মহাবল স্বরূপ ছিল। গণেশ ও পরশুরামের লীলার মাধ্যমে গণেশের প্রকৃত আত্মপরিচয় এবং পরশুরামের প্রকৃত আত্মপরিচয় অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সেই কাহিনীর বিস্তারিত ব্যাখ্যান আছে।

ত্রেতাযুগে সীতার স্বয়ম্বর সভায় ভগবান শ্রীরাম কর্তৃক পরশুরামের শিবধনুভঙ্গ হওয়ায় সেই বার্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পরশুরাম তথায় আগমন করিয়া শ্রীরামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন এবং স্বীয় করস্থিত ধনু প্রদানপূর্বক তাহাতে গুণ আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীরামকে আহ্বান করেন। শ্রীরাম অবলীলাক্রমে সেই নবগুণসম্পন্ন ধনুকে শরসন্ধান করিয়া বলিলেন, ''এক্ষণে কোথায় শর নিক্ষেপ করিব?'' অবশেষে পরশুরামের তপোলব্ধ সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া সমস্ত লোকগত সঞ্চিত শক্তি নষ্ট করিয়া তিনি শর সন্ধান করিলেন। ইহাতে পরশুরামের বিশুদ্ধ অহংকার চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি তখন তাঁহার ক্রোধ সম্বরণপূর্বক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা শ্রীরামের আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া বিনয়পূর্বক স্তব করিলেন। তারপর তিনি পুনঃতপস্যার্থ হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন। ভগবান শংকরের বরে পরশুরাম অমরত্বলাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ভগবান পরশুরামের প্রকাশ পরমব্রহ্মস্বরূপ পরমগুরুরূপে। তিনি কুরু-পাণ্ডব অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রগুরু ছিলেন। সর্ব্বস্ব দানেচ্ছু পরশুরামের নিকট হইতে দ্রোণ অস্ত্রশস্ত্র ও তাহাদের প্রয়োগ কৌশল দান স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্তীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান কল্কি পরশুরামের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নান্তে কল্কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে চাহিলে পরশুরাম বলিলেন — ''তুমি সিংহল দ্বীপে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণ পূর্বক সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করিবে। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্মবর্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাস্ত করিয়া অনাচারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিবে। অতঃপর দেবাপি ও মরু (ইক্ষ্বাকু বংশীয় শীঘ্র-তনয় মরু) নামক ধার্মিকদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।'' অর্থাৎ, ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন পরশুরাম।

হিমালয়ের গহনে জ্ঞানগঞ্জে আজও বিরাজিত রহিয়াছেন জন্মরহিত অবতার পুরুষ ভগবান পরশুরাম। জ্ঞানগঞ্জের মহান আচার্য্যপদে তিনি 'ভৃগুরাম স্বামী' নামে অভিহিত আছেন। যোগাচার্য্য ভৃগুরাম স্বামী শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের যোগীশ্বর গুরুদেব। তাঁহার উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ কোটি কোটি প্রণাম।

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(১২)

রেলওয়েতে চাকুরী—

হার্বার্ট সাহেবের আলয়ে মাণিকলাল নিয়মিতভাবে পরমার্থিক আলোচনায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পৈতৃক ব্যবসা, যাহা তিনি রাজা বদ্রীদাসের আনুকূল্যে শুরু করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমেই অচল হইয়া পড়িল এবং যাহার অনিবার্য্য ফল হিসাবে মাণিকলাল নিদারুণ অর্থ-কষ্টের সম্মুখীন হইলেন। পরন্তু পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইত বলিয়া তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি প্রদান করিতে হইত। হার্বার্ট সাহেবের কিন্তু ধারণা ছিল মাণিকলালের পৈতৃক ব্যবসা বেশ লাভজনক ভাবে চলিতেছে। যাহা হউক কিছুদিনের মধ্যেই রেলওয়েতে একটি চাকুরীর সন্ধান মিলিল। কলিকাতায় পার্কস্ট্রীটে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বুকিং অফিসে একটি সুপার ভাইজারের পদ খালি হয়। পদপ্রাপ্তির আশায় মাণিকলাল উক্ত রেলওয়ের তদানীন্তন ট্রাফিক ম্যানেজার পি. সি. শেরিডন সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিলেন। সাহেবদের সহিত ক্রমাগত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলার ফলে মাণিকলালের মন হইতে তখন সাহেব ভীতি অপসারিত। উক্ত পদটির কার্য্যভার ছিল বড়ই বিপদজনক। তখন রেলওয়েতে সমুদ্রগামী জাহাজের সরাসরি (Through) বুকিং-এর নিময় প্রচলিত ছিল। বহু পদ-মর্য্যাদা সম্পন্ন সাহেব দম্পতি ও ইংরাজ সৈনিকদের এই অফিসে বুকিং-এর জন্য আগমন ঘটিত। তাঁহাদের ভাব ও ভাষা কোনো সুপারভাইজারের সহজে বোধগম্য না হইলে, সেই সুপারভাইজার যদি তাহা পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য একাধিকবার "Beg your pardon" বলিতেন তাহা হইলে বিশেষ করিয়া রুক্ষ প্রকৃতির সৈন্যদের দ্বারা তাহার ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা, এমন কি মারধোরও জুটিত। সেইজন্য উক্ত পদের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে মাণিকলালের নিকট শেরিডন সাহেব আনুপূর্বিক সব কিছু বিশ্লেষণ করিয়া, ঐ পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। অতি নম্রভাবে মাণিকলাল উত্তর দিলেন, ‘‘আমি পারিব বলিলে ভুল হইবে। কারণ আমার দ্বারা কোন কাজই সম্ভব নয়, যদি না আমার প্রতি কর্মে মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। ("My strength is made Perfect in weakness") চাকুরী-প্রার্থীর পক্ষে তাঁহার কর্মদক্ষতার স্বপক্ষে এইরূপ উক্তি নিশ্চয় অনিষ্টকর, কিন্তু যেহেতু শেরিডন সাহেব — ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি মাণিকলালের উক্তির তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া হৃষ্টচিত্তে ১/১২/১৯১২ তারিখ হইতে মাণিকলালকে উক্ত পদে নিয়োগ করিলেন। তদবধি কিছুকাল যাবৎ বিশেষ পরিশ্রমের সহিত শঙ্কিত হৃদয়ে ঐ অফিসে কাজ করিতে হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে মাণিকলালের অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক ঈশ্বরবাক্য পরিবেশনার কথা, ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহের বিশ্লেষণের কথা-মাধুর্য্য তদানীন্তন বেঙ্গল ক্লাবের, কলিকাতা ক্লাবের ও ঐ ধরণের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানী-গুণী সাহেবদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ঐ সময় এফ. জি. উইগ্লি সাহেব ছিলেন বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের প্রধান সচিব। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছদ্মবেশে প্রায়ই বৈকালে লাঠি হস্তে পার্কস্ট্রীট বুকিং অফিসে আসিতেন। তাঁহার মোটরগাড়ীটি বুকিং অফিসের কিছুদূরে রাখিয়া তথায় তাঁহার দেহরক্ষীদের অপেক্ষা করিবার নির্দেশ দিয়া তিনি মাণিকলালের সম্মুখে উপনীত হইতেন ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাণিকলালকে কিছু কিছু ধর্ম কথা ব্যক্ত করিবার জন্য অতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাইতেন। সাহেবের প্রকৃত পরিচয় দীর্ঘদিন মাণিকলালের নিকট অজ্ঞাত ছিল; সেই কারণে উক্ত সাহেবকে সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া মাণিকলাল অতি অবহেলাভরে তাঁহার পাশ্ববর্তী একটি টুলে তাঁহাকে বসিতে দিতেন ও দিনান্তে নিজের কাজকর্ম সমাধা করিতে ব্যস্ত থাকিলে ঐ বৃদ্ধকে কিছু কিছু শাস্ত্রকথা পরিবেশন করিতেন। বৃদ্ধ কদাচ আপন পরিচয় ব্যক্ত করিতেন না। কালেভদ্রে ঐ অফিসে মাণিকলালের পিতা শ্যামাচরণ দত্তেরও আগমন ঘটিত। ঐ বৃদ্ধ সাহেবকে কর্মরত আপন পুত্রের পার্শ্বে প্রায়ই লক্ষ্য করিয়া মাতৃভাষায় তিনি পুত্রকে বলিতেন, ‘‘এই বুড়োটা রোজ রোজ কেন তোমাকে জ্বালাতে আসে? তোমার এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ যদি টাকা পয়সার হিসাবে কোন ভুলচুক হয় তবে টাকার খেসারৎ দেওয়ার সামর্থ তোমার হবে না।’’ বৃদ্ধের মনে কিন্তু কোন অভিমান স্থান পাইত না। তিনি মাণিকলালের পার্শ্বে টুলে উপবেশন করিয়া দৈব-কথা অতি আনন্দিত চিত্তে শ্রবণ করিতেন।

একদিন ঐ বৃদ্ধ সাহেব মাণিকলালের নিকট তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া Passage book করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাহেবের যে অবস্থার সহিত মাণিকলালের পরিচয় ছিল তাহা বিবেচনা করিয়া সহানুভূতির সহিত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাবদ কত খরচ পড়িবে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সাহেবের অনুমতি চাহিলে সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, "তৃতীয় শ্রেণীই ঠিক; তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কি ব্যয় হইবে তাহাও জানাইলে ভাল হয় কারণ, বুড়ী মেমসাহেব, আর ভারতবর্ষ হইতে এই শেষ যাত্রা, যদি সংশ্লিষ্ট অর্থের সংস্থান করিতে পারি তাহা হইলে উচ্চতর শ্রেণীতেই যাইবার চেষ্টা করিব।" আগামীকাল এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত হইবেন বলিয়া তিনি সেইদিন স্থান ত্যাগ করিলেন। অনন্তর মাণিকলাল সাহেবের অনুরোধ মত তিনটি শ্রেণীর ভাড়া বাবদ পৃথক পৃথক ভাবে কি অর্থ লাগিবে তাহা নিরূপণ করিয়া পরদিন তাঁহার সমীপে আগত সাহেবকে অবহিত করিলে, সাহেব উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইয়াছে, তিনি যেন প্রথম শ্রেণীরই Passage book করিয়া দেন। সেইমত মাণিকলাল উক্ত সাহেবের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া Passage book করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পর মাণিকলালকে একটি অভাবণীয় ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইল। এক অপরিচিত মেমসাহেব বড় একখানি মোটরগাড়ী যোগে ঐ Booking Office-এ আগমন করিয়া অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ পদক্ষেপে মাণিকলালের নিকট উপস্থিত হইয়া বর্তমানে ইংল্যাণ্ডগামী যে যাত্রীবাহী জাহাজ রওনা হইবে তাহাতে তাঁহার কোন পরিচিত স্বদেশবাসী Passage book করিয়াছেন কিনা সংশ্লিষ্ট খাতা হইতে তাঁহাদের নামগুলি দেখাইবার জন্য আনুরোধ করিলেন। মাণিকলাল বিশেষ আগ্রহভরে উক্ত খাতাটি মেমসাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। খাতায় লিখিত যাত্রীদের নামের তালিকা পরীক্ষা করিয়া মেমসাহেবের মুখে ভাবান্তর ঘটিল ও তিনি মাণিকলালকে উদ্দেশ্য করিয়া কঠিন ভাষায় বলিলেন — "Nonsense, why have you not put Hon'ble Sir, before the name of F.G.Wigly. Don't you know he is the Chief Secy. of the Govt. of Bengal? Book my passage with him in the same compartment." বিনা মেঘে মাণিকলালের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। এই মেমসাহেবের তিরস্কার — তাঁহাকে আঘাত করিল না কেবল মনে মনে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে কি ভাবেই না উইগ্‌লি সাহেবকে অসম্মান করিয়াছেন। মাত্র একটি টুলে বসিতে দিয়াছেন, দুই একটি ভগবৎ বাক্য যেন বিশেষ কৃপা করিয়া বলিয়াছেন এবং বর্তমানে কিভাবে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করা যায়? মেমসাহেবের জন্য সত্তর বুকিং-এর যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া মাণিকলাল Mr.Wigly-র ঠিকানা বাহির করিলেন। Passage booking-এ ভুলভ্রান্তি এড়াইবার জন্য আগত প্রতিটি যাত্রীরই ঠিকানা ও ক্ষেত্র বিশেষে ফোন্ নম্বরটি লিখিয়া রাখাই ছিল মাণিকলালের স্বভাবসিদ্ধ রীতি। বৈকালে মাণিকলাল উইগ্‌লি সাহেবের ঠিকানা দৃষ্টে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার আশায় তাঁহার বাসভবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইলেন। প্রবেশ পথে রক্ষীরা মাণিকলালের আন্তরিক উপরোধ সত্ত্বেও অভ্যন্তরে যাইবার অনুমতি দিল না। মাণিকলাল কিন্তু ভিতরে যাইবার সিদ্ধান্তে অটল। এমতাবস্থায় উইগ্‌লি সাহেব সেই ভবনের দ্বিতল হইতে মাণিকলালকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে সাদরে লইয়া গেলেন। এই অবস্থা দৃষ্টে রক্ষীরাও বিস্মিত হইল। মাণিকলাল উইগ্‌লি সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বলুন আপনি আমায় ক্ষমা করিয়াছেন।" মাণিকলালের এই উক্তিতে তিনি বিস্ময় বোধ করিয়া বলিলেন যে, "ক্ষমা করিবার প্রশ্ন কেন উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না" কারণ মাণিকলালের কোন অপরাধ কোন দিনের জন্যও তাঁহার গোচরীভূত হয় নাই। ইহার উত্তরে মাণিকলাল অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনাকে সামান্য একটি টুলে বসিতে দিয়াছি, কত অবজ্ঞাভরে মাত্র কিছু কিছু প্রভুর বাক্য ব্যক্ত করিয়াছি, কিন্তু আপনি এত বড় আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যে আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মাত্র ঈশ্বর বাক্য শ্রবণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য এই দীনতা ও কৃচ্ছ্রতা দিনের পর দিন অকপটে সহ্য করিয়াছেন। এই কারণে নিজেকে আজ অত্যন্ত অপরাধী বোধ হইতেছে। আমায় এতটুকু আশ্বাস দিন যে, আমার এই ত্রুটি আপনি নিজগুণে মার্জনা করিয়াছেন।" *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের শিষ্য,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ — (*পূর্ব প্রকাশিতের পর....*)

মুক্তি দ্বারা জীব নাশপ্রাপ্ত হয় না। নির্বাণ-মুক্তির সে অর্থ নহে। নাশপ্রাপ্ত হইলে কেহ তজ্জন্য প্রযত্ন করিতেন না; কারণ

আপনার নাশ কেহই ইচ্ছা করেন না এবং তাহা হইলে পরম হিতৈষিণী শ্রুতিও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন না।

জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে লোকব্যবহারাদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। জীবন্মুক্ত গুরু শিষ্যকে মুক্তির উপদেশ প্রদান করেন। ইহা শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তিনি যদি বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে চেতনা বিহীন হইতেন, তাহা হইলে উপদেশ কিরূপে দিতে পারিয়াছেন। জীবন্মুক্ত হইয়াও দেহ অনেকদিন থাকিতে পারে। জীবন্মুক্ত হইলে আর দেহ থাকিবে না, ইহা ভ্রান্তি। অবশিষ্ট কর্মফল ভোগের জন্য দেহ থাকে ভগবদ্গীতায় আছে — 'জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাপদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং'। ইহার অর্থ — উপাসক জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ করেন। 'আময়' শব্দের অর্থ রোগ, পীড়া। 'অনাময়' শব্দের অর্থ রোগশূন্য। যেমন একজন অগ্রে রোগগ্রস্থা থাকে, পরে চিকিৎসা দ্বারা ঔষধ ও পথ্য সেবনে রোগমুক্ত হয়েন, সেইরূপ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য জীব উপাসনা দ্বারা ভবরোগমুক্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানোদয় ও জ্ঞানোদয়ে-মুক্তি সাধনের স্বাভাবিক ফল। তাহা এক সময়ে লাভ নিশ্চয়ই হইবে। ভগবদ্গীতায় আছে — 'অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং'! ইহার অর্থ — আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে ইহকালে ও পরকালে উভয়ত্রই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। কেবল যে মৃত্যুর পর কৈবল্য বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ হইবে, তাহা নহে, দেহ থাকিতেই হয়।

ঈশ্বর-ভক্তগণ ঈশ্বরের সেবাপরায়ণ। তাহারা ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকের সাম্রাজ্য ও মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্তি আছে — 'দীয়মানং ন গৃহ্ণাতি বিনামৎ-সেবনং জনাঃ'। মুক্তি প্রভৃতি তাহাকে দিতে গেলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ইহাই ঈশ্বর-ভক্তের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুক্তি অপেক্ষা সেবাকেই তাঁহারা অধিক বলিয়া জানেন। কিন্তু ঐভাবে ঈশ্বরারাধনার ফলে জ্ঞানোদয় ও মুক্তি অনিবার্য। ঈশ্বর সেবা-ভক্তি প্রিয়, ইহা সত্য। কিন্তু এরূপ ভক্তকে নিজসেবা জন্য অধিক দিন তিনি বন্ধনগ্রস্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন না। ঈশ্বর সর্ব্বকর্মফলদাতা। সাধন কর্মেরও ফলদাতা। ইহাই তাঁহার নীতি। তাঁহার ভক্ত এই দেহে হউক, বা দেহান্তে হউক, নিশ্চয়ই জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ করেন।

দেহ থাকিতে মুক্তিলাভ হইলে আর ঈশ্বর-ভক্তি থাকিবে না - এরূপ কল্পনাও ঠিক নহে। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি মুক্ত হইয়াও ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা ভক্তির আচার্য্য। মুক্ত পুরুষগণই ভক্তিতত্ত্বের উপদেষ্টা।

ভক্তগণ বলেন — মুক্তি ভক্তির দাসী, কারণ আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্তি আপনিই আসিয়া পড়ে। জ্ঞানোদয় ও মুক্তি ভক্তিযোগে উপাসনা অবশ্যম্ভাবী ফল। ভগবদ্গীতার প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তির প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এই উভয়ই এই শাস্ত্রসম্মত। উহারা পরস্পর বিরোধী হইলে একটির প্রশংসা থাকিত, উভয়ের প্রশংসা থাকিত না। ভক্তিমার্গের অনেক উপাসক ভক্তিকে জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া জানেন, এরূপ জ্ঞানমার্গীয় অনেক উপাসক জ্ঞানকে ভক্তির বিরোধী বলিয়া জানেন। কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। অদ্বৈতবাদীগণের উপাসনার জন্য শাস্ত্রীয় দ্বৈতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহারা স্বীকার করেন। গুরুমুখ হইতে ও শাস্ত্র হইতে তত্ত্বকথা শ্রবণপূর্বক উপাসনা সমস্তই শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে সকলে যে ঈশ্বরারাধনার বিরোধী তাহাও নহে। তাহাদিগকেও ভক্তিযোগে ঈশ্বরারাধনাকে অদ্বৈতজ্ঞানের অঙ্গীভূতভাবে গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এইরূপ ভক্তিমার্গের উপাসকদিগের মধ্যেও অনেককে অদ্বৈত তত্ত্বের আশ্রয় লইতে দেখা যায়। শ্রুতি

উপদেশানুসারে ঈশ্বরকে সর্বভূতান্তরাত্মা জানিয়া তাহারা অভেদভাবে ঈশ্বরের ভজন করেন।

জ্ঞান ও ভক্তিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের পোষকভাবেই জ্ঞান করা উচিত। ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান গুরু ও শাস্ত্র হইতে লাভ করিয়া, পরে ভক্তিমার্গের উপাসনা হইয়া থাকে। ভক্তিমার্গের উপাসনা দ্বারা সর্বদা তচ্চিন্তন বশতঃ ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিগম হয় এবং ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয়। অগ্রে ভেদভাবে ভজন থাকিলেও চিত্তশুদ্ধি বশতঃ অভেদভাবে ভজন স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে জ্ঞানোদয়ে মুক্তি হয়। ভক্তিপথে সাধনের দ্বিবিধ সোপান থাকার বিষয় ভক্তিশাস্ত্রে উক্তি আছে — যথা - গৌণীভক্তি, পরাভক্তি। গৌণীভক্তি দ্বারা প্রথমে ভেদভাবে উপাসনা হয়। পরে পরাভক্তি দ্বারা অভেদভাবে উপাসনা হয়। পরাভক্তি অতি সূক্ষ্মা, তীব্রা এবং অমৃত স্বরূপা ও জ্ঞান লক্ষণা। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্তি আছে —

"ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভুতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

ইহার অর্থ — ব্রহ্মভূতঃ শব্দের অর্থ - অপগত রজস্তমো মলঃ। উপাসনা করিতে করিতে চিত্ত হইতে রজো ও তমোমল অপগত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপে স্থিত হয়। তখন চিত্তের প্রসন্নতা, আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা, শোকশূন্যতা, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, এইসকল আসিয়া থাকে। সেই অবস্থায় জ্ঞান-লক্ষণা পরাভক্তির উদয় হয়। পরে বলিলেন —'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদানন্তরং।' এখানে 'ভক্ত্যা' শব্দের অর্থ — পরয়াভক্ত্যা অর্থাৎ পরাভক্তিদ্বারা। 'অভিজানাতি' শব্দের অর্থ — বিশেষরূপে জানেন। অগ্রে কিছু কিছু জ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে অবশ্যই হইয়াছিল। এক্ষণে বিশিষ্ট জ্ঞানের উদয় হইয়া কিরূপে পরমাত্মাকে জানেন তাহা বলিতেছেন। যাবান্ অর্থাৎ পরমাত্মা কিরূপ বৃহৎ - অর্থাৎ, তিনি যে সর্বব্যাপী তাহা জানেন। তিনি যে তত্ত্বতঃ সচ্চিদানন্দরূপ তাহা জানেন।

যেখানে ভগবদ্গীতায় তত্ত্বতঃ শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে তাঁহার গুণাতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে। 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা' ইহার অর্থ — তাঁহার নির্গুণ, মায়াতীত, সর্বাতীত স্বরূপ সচ্চিদানন্দরূপে জ্ঞানোদয় হয়, ইহাই তত্ত্বতঃ শব্দের অর্থ। তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া কি হয় তাহাই বলিতেছেন — বিশতে তদনন্তরং। তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাকেই নির্বাণমুক্তি বা কৈবল্যমুক্তি বলে। এই সম্বন্ধেই পূর্বে উক্ত হইয়াছে — 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং'। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে এই দেহ থাকিতে এবং দেহান্তেও ব্রহ্মনির্বাণ হয়। ইহাই সম্পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি। শ্রুতি এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন — 'ব্রহ্মাপি সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি' — ইহার অর্থ — তিনি ব্রহ্ম ছিলেন না, ব্রহ্ম হইলেন, তাহা নহে। তিনি ব্রহ্ম থাকিয়াই সর্বোপাধি বর্জিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন পরিপূর্ণ শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন, ভক্তিযোগে আরাধনাতেই রস কিন্তু নির্বাণ বা কৈবল্যমুক্তিতে রস নাই। ইহা ভ্রান্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন —'রসো বৈ সঃ, আনন্দং বৈ সঃ। আনন্দেন সহ আনন্দী ভবতি।' ইহার অর্থ — পরমাত্মা রস স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দময় হয়। শ্রুতি তাঁহাকে অখণ্ডৈক রস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ণ অনন্ত রসের সাগর তিনি। ঐ সাগর হইতে কিঞ্চিৎ রস ক্ষরিত হইয়া আসিয়া উপাসককে মত্ত করে। পূর্ণরস ভাণ্ডারে রসের ইয়ত্বা নাই। জীব মুক্ত হইয়া সেই পূর্ণ অখৈণ্ডক রসের ভাগী হয়। অতএব মূলে রস নাই, শাখা প্রশাখাতে রস ইহা অলীক। শ্রুতি বলিয়াছেন — যথা জলে জল সিক্তং ইত্যাদি — যেমন সমুদ্র হইতে কিছু জল উত্তোলিত করিয়া পরে যদি সেই জল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আর সেই জলের পৃথকত্ব থাকে না, সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যে মিলিত হইয়া সেই জীবের অনন্তত্ব হয়। বেদান্ত-দর্শনে উক্তি আছে — 'অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গং'। সেই অখণ্ড চৈতন্যের প্রকৃত বিভাগ নাই। তিনি নিরংশ, অংশ কলাদি রহিত। বিদেহমুক্তিকালে তাহাই অভিব্যক্ত হয়।

...ক্রমশঃ

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

দোল পূর্ণিমা — ৯ই মার্চ, সোমবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২২শে মার্চ, রবিবার
অন্নপূর্ণা পূজা — ১লা এপ্রিল, বুধবার
রাম নবমী — ২রা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
নববর্ষ — ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের সৎ-কথা।

পুরাণ কথা

ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র 'দ্রোণাচার্য্য' মহাভারতের এক সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র। একদা মহর্ষি ভরদ্বাজের ঘৃতাচী অপ্সরা দর্শনে রেতঃস্খলিত হয়। সেই ওজস্বী বীর্য্য তিনি একটি দ্রোণে (কলসীতে) রক্ষা করেন এবং তাঁহার তপোবলে তাহা হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রোণ হইতে জন্ম বলিয়া সেই পুত্র 'দ্রোণ' নামেই বিখ্যাত হন। মহর্ষি অগ্নিবেশ্য মহর্ষি ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। ভরদ্বাজ কোনো এক সময় তাঁহাকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অগ্নিবেশ্য সেই অস্ত্রটি গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন। দ্রোণ ক্রমে পিতার নিকট সমগ্র বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া লইলেন। পাঞ্চাল রাজ্যের অধিপতি পৃষত নামক নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাঁহার দ্রুপদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমনপূর্বক দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিছুকাল পরে নরপতি পৃষত পরলোকগমন করিলে তখন মহাবীর দ্রুপদ সমগ্র উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি ভরদ্বাজও স্বর্গারোহণ করিলে পরে তখন মহর্ষি দ্রোণ পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। পরবর্তীকালে দ্রোণ মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন এবং ধর্মপরায়ণা কৃপী 'অশ্বত্থামা' নামক এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এই সময়ে মহাত্মা জমদগ্নি-নন্দন ভগবান পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্বস্ব প্রদান করিতেন শুনিয়া দ্রোণ তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। পরশুরাম তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তখন তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যা ও তাহাদিগের রহস্য সমূহ ধনুর্বেদ-বিদ্যা প্রদান করিলেন। দ্রোণ পরশুরাম হইতে ঐ সমুদয় বিদ্যালাভ করিয়া তৎপরে পরমপ্রীত মনে তাঁহার প্রিয় সখা দ্রুপদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন —"রাজন্! আমি তোমার সখা!" দ্রুপদ তখন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া দ্রোণকে তাচ্ছিল্য ও অপমানিত করিয়া বলিলেন —"আমার মত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতির সহিত তোমার মত শ্রীহীন নির্ধন মানুষের কিছুতেই বন্ধুত্ব হইতে পারে না।" দ্রোণ দ্রুপদের এই কটুক্তি শ্রবণে অতি ব্যথিত হইয়া তখন সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর দ্রোণ হস্তিনানগরে গমন করিয়া স্বীয় শ্যালক কৃপাচার্য্যের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর ধন সম্পদ প্রদান করিয়া তাঁহার জন্য সুরম্য বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন। সেথায় অস্ত্র শিক্ষার্থ সকলে সমবেত হইলে পরে আচার্য্য দ্রোণ শিক্ষার্থীদের বলিলেন —"শিক্ষা সমাপনান্তে আমার এক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।" দ্রোণাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণে তখন দুর্য্যোধনাদি সকলেই নীরব রহিলেন, কেবল অর্জুন বলিলেন —"যতই কষ্টকর হউক আমি আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব।" ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য তখন অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপাত করিলেন। কিছুকাল পরে অস্ত্রশস্ত্রের জ্ঞানে সকলেই কৃতবিদ্য হইলেন। গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদের অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষাও নিলেন। তখন দ্রোণ ছাত্রদিগকে বলিলেন, "তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে ধরিয়া লইয়া আইস। ইহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণা হইবে।" এই কথা শুনিয়া কৌরব-পাণ্ডব সকলেই তখন যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, কিন্তু অন্য সকলেই পরাস্ত হইলেন, কেবল অর্জুন অতি বৈশিষ্ঠ্যতাপূর্ণ কঠোর যুদ্ধে দ্রুপদকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার সচিবকে গ্রহণপূর্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যকে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে হৃতসর্বস্ব, ভগ্নদর্প ও বশতাপন্ন দেখিয়া বলিলেন —"আমরা ব্রাহ্মণ তোমার প্রাণনাশ করিব না, পরন্তু সমগ্র রাজ্যও ফিরাইয়া দিব না। ভাগীরথীর দক্ষিণকুল তোমার এবং উত্তরকুল আমার রহিল।" এইভাবে দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরবর্তীকালে মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের হস্তেই দ্রুপদ নিহত হন এবং দ্রুপদের তপোলব্ধ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হন। মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়াই সমরশায়ী হন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর। পূর্বে 'দ্রোণেশ' নামক কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ পূজার ফলে দ্রোণাচার্য্য পুনরায় জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করিয়া উত্তম স্বর্গলোকে গমন করেন।

(*সহায়ক গ্রন্থ : মহাভারত ও স্কন্দপুরাণ*)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৭২)

শ্রীশ্রীবাবার (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) এক ক্রিয়াবান সন্তান তাঁকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন; সেই নিষ্ঠাবান ভদ্রলোকের নিজের মুখনিঃসৃত কয়েকটি ঘটনার কথা আমি 'যোগীশ্বর দাদার কীর্তি' বলে এখানে উদ্ধৃত করলাম —

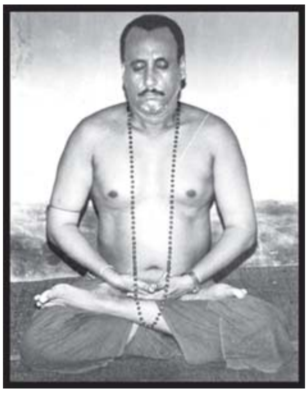

একবার, দিন সাতেক ধরে আমার (জনৈক ক্রিয়াবান শিষ্য) বুকেতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল, তখন আমি কোনোরকম ডাক্তার বা ওষুধের সাহায্য নিইনি। যন্ত্রণা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। একদিন বাধ্য হয়ে আমার ছোট কাকার বড় ছেলেকে দাদার কাছে পাঠালাম। আমাকে দাদা যে নামে ডাকতেন তাই বলে তাকে বললাম যে দাদাকে বলবি আমার যন্ত্রণার অবস্থার কথা। ভাই ফিরে এসে জানালো, "তোমার গুরুদেবকে সব জানিয়েছি।" উনি বলেছেন, "ঠিক আছে।" পরের দিন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দাদার কাছে যেতে দাদা নবদাকে বললেন, "ও কতটা সহ্য করতে পারে তার পরীক্ষা করছিলাম।"

প্রসঙ্গ (৭৩)

এই ঘটনাটি দাদার মুখে শোনা — উনি (শ্রীশ্রীবাবা) তখন শিবপুর শ্মশানে সাধনা করতে যেতেন রাতে। তখন শীতকাল, ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে, দাদা গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে আছেন দেখে ওনার মা ডেকে বললেন — "কিরে! আজ শ্মশানে গেলিনা?" উনি ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির অজুহাত জানাতে মাতারানী দাদাকে জানান —"আজ গেলে হয়তো মাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলতে পারে!" অগত্যা মাতৃআদেশ শিরোধার্য্য করে বিছানার মায়া ত্যাগ করে দ্রুত হেঁটে পাড়ি দিলেন জগন্মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে শিবপুর শ্মশানে। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। এটুকু বলেই দাদা আর কিছু খুলে বললেন না। এর পরবর্তী ঘটনা কেবল দাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যা আমাদের আগোচরে। মায়ের কল্যাণ কামনার নির্দেশ পালন করলে সে ফল হয় মঙ্গলদায়ক। যে মাতা আধ্যাত্মিকতার পূর্ণমনা তাঁর কল্যাণ-ইচ্ছা কখনোই বিফল হয় না। শ্রীশ্রীবাবার মাতৃদেবী শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরিমহারাজের গুরুগত প্রাণা একনিষ্ঠ ক্রিয়াবান ছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁর মায়ের কথাকে কোনোদিন অবহেলা করতেন না।

প্রসঙ্গ (৭৪)

দাদার বাড়ীতে দুর্গাপূজা চলছে, খুব সম্ভবতঃ সেদিন অষ্টমী কি নবমীর সকালবেলা ছিল। দাদা একজন শিষ্যকে ডেকে জানতে চাইলেন সে ক্রিয়া সাধন করে কিনা? উত্তরে তিনি জানান — "ঠিকমত হয় না, এবার ঠিক করেছি পুজোর পর শুরু করব।" উত্তরে দাদা বললেন —"সামান্য পাঁচ টাকার বিনিময়ে লাইনটা জানা গেল। মন্দ কি? কাজ নিয়েছিলি কেন? আজকাল তো ঐ টাকার বিনিময়ে চা বিস্কুটও পাওয়া যায় না।" দাদা বললেন —"ধর্ম করতে গেলেও টাকা পয়সা লাগে। আজকাল টাকা-পয়সা ছাড়া ধর্ম হয় না।"

প্রসঙ্গ (৭৫)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক নৈষ্ঠিক ক্রিয়াবান, ওনার মুখনিঃসৃত গুরুমহারাজের কিছু বিশেষ ঘটনার কথা —

দাদার মুখে শোনা — দাদা তখন পাহাড়ে থাকতেন নাঙ্গাবাবার কাছে। উনি দাদাকে 'বঙ্গালীভূত' বলে ডাকতেন। একবার নাঙ্গাবাবা বিশেষ কাজে কোথাও যাবেন, তাই দাদার ওপর অন্যান্য গুরুভাইদের ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। এতে দাদাতো ভারী খুশি — উনি সবার মাথার ওপর বসে আর অন্যরা সব কর্ম করছে, উনি দেখছেন, কেউ বক্রভাবে বসলে চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরে সোজা করে দিচ্ছেন। গুরুভাইদের দিয়ে দাদা ব্যাসপীঠের গুফার দ্বারে 'গুরুকৃপাহি কেবলম্' লেখা লতাপাতার ঝাড়ি দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর কেরী তৈরী করালেন। নাঙ্গাবাবা ফিরে এলে দাদার নির্দেশনায় ফুল ও লতাপাতার নির্মিত কেরী দেখে খুবই খুশি হলেন।

একবার নাঙ্গাবাবা দাদাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়েছেন; দাদাকে উনি বললেন —"তোকে আজ এক মহাত্মার সমাধিতে প্রাণত্যাগের পদ্ধতি দেখাব।" তারপর ওনারা দুজনে যথাস্থানে উপস্থিত হলে দাদা দেখলেন — একজন যোগমুদ্রায় আসনে সমাধিমগ্ন আর তাঁকে গোল করে ঘিরে অনেক মহাত্মারা বিশেষভাবে বন্দনা করছেন। ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে উপবেশিত মহাত্মার ব্রহ্মতালু যেন ক্রমান্বয়ে

আবের মতন আকার ধারণ করল আর সমবেত মহাত্মারা পাহাড়ী লতা-গুল্মের প্রলেপ দিতে লাগলেন মস্তকের সেই স্ফীত স্থানটিতে। তারপর ক্রমশঃ সেটি বিশাল আকার ধারণ করে ফেটে যায়। তখন সে স্থানটির চারিদিক দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এরপর সকলে মিলে সেখানেই তাঁর সমাধি দেওয়া হয়। নাঙ্গাবাবা বললেন — ''এইভাবেই উচ্চকোটীর মহাত্মারা তাঁদের ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়ে মহাব্যোমে ব্রহ্মে বিলীন অবস্থায় যোগাবলম্বন পূর্বক প্রাণত্যাগ করেন।'' সেখানে যে কাজের জন্য সকলের আসা তা সমাপ্ত হলে সবাই চলে গেলে পরে তখন শুধু নাঙ্গাবাবা আর দাদা। নাঙ্গাবাবা দাদাকে বললেন,''আমি চলি, তুই এখানে ধ্যানে বস্।'' অগত্যা দাদা তখন ধ্যানে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরল তখন দাদার ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছিল। ঠাণ্ডা জায়গায় ঠাণ্ডা হওয়াটাই স্বাভাবিক, তিনি তো এতে অভ্যস্ত কিন্তু সেদিন যেন অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা তাঁকে আসনচ্যুত করে ছাড়ছিল। তারপর হঠাৎ দাদার মনে হল যেন আসনটা সচল। পরে দাদা দেখলেন যে দাদা যার উপর বসে ধ্যান করছিলেন সেটি একটি অজগর জাতীয় বিশাল মোটা সাপ! আসন চলতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে দাদাকেও যেতে হচ্ছে কিন্তু এমন মহানিশা যে কিছু করবার উপায়ও নেই। দাদা বললেন —''তখন শুধু আমি আর সাপ; সাপ তার স্বাভাবিক গতিতে গতিময়, আমি তখন নাঙ্গাবাবার শেখানো বিশেষ পদ্ধতিতে নাঙ্গাবাবার কুটীরে যাত্রা করলাম। এসে দেখলাম, নাঙ্গাবাবা কুঠিয়াতে বসে আছেন আর হাসছেন।''

পাহাড়ী জীবিকার বিষয়ে দাদা বললেন — ''সমতল থেকে পাহাড়ের উচ্চতায় খাদ্যাদি ও শ্রম সাধারণতঃ কোন সাধকের ক্ষেত্রে দুঃসাধ্যকর ব্যাপার কারণ সব সাধক তো আর বায়ুভক্ষণকারী নয়। তাই কোন পর্য্যটক একশো টাকার পরিবর্তে যদি কোনো সাধুকে দুটো শুখারুটি দেয় তো সাধু তাতে পরম প্রীত হন। যদিও এসবের বিকল্প আছে যারা তার সন্ধান জানে। 'চমরী গাই'য়ের অতিরিক্ত দুধ মাটিতে জমাট বাঁধা অবস্থায় পেলে তা সেবন অথবা পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে একরকম ফল পাওয়া যায় তার ভেতর অসংখ্য পোস্ত দানার মত দানা থাকে; যদি সামান্য দুটি দানা ভক্ষণ করা যায়, তবে দুই-তিন দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা সবরকমের ক্লান্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃ-পিতৃ চরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৫)

বন্দেহহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্।। ৭৮

সচ্চিদানন্দং, ভেদাতীতং, নিত্যং, পূর্ণং, নিরাকারং, নির্গুণং, স্বাত্মসংস্থিতং, শ্রীমদ্‌গুরুম্ অহং বন্দে।।৭৮

তিনি সৎস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার নিকট গেলেই অসৎ জগতের জ্ঞান ঘুচিয়া একমাত্র তিনিই সৎস্বরূপে আছেন এবং অপর কিছু নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তিনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার নিকট গেলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনিই জীবমধ্যে আছেন বলিয়া জীব চৈতন্যযুক্ত হয়, এবং তাঁহার অভাবে জীবদেহ শবে পরিণত হয়। তিনি আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাতে থাকিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎসঙ্গে আনন্দে আছি এবং ইন্দ্রিয়বশে দূরে গিয়াই দুঃখাভিভূত হই। তিনি ভেদাতীত এবং তাঁহাতে গেলেই জীব ভাল-মন্দ ভেদজ্ঞান রহিত হয়। তিনি শ্রীযুক্ত, শ্রী - অর্থে শোভা, সম্পদ্, বুদ্ধি এবং কীর্ত্তি বুঝায়; এ সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে আছে বলিয়া তিনি শ্রীমান্। তদীয় সম্পর্কে আসিয়া জীব বুঝিতে পারে যে, জাগতিক কালিমা তাহার ঘুচিয়াছে এবং সে সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি জীবের সম্পদস্বরূপ কারণ তিনি জীবের একমাত্র সম্পদস্বরূপ হইয়া জীবকে সদাই রক্ষা করিয়া থাকেন এবং অপর

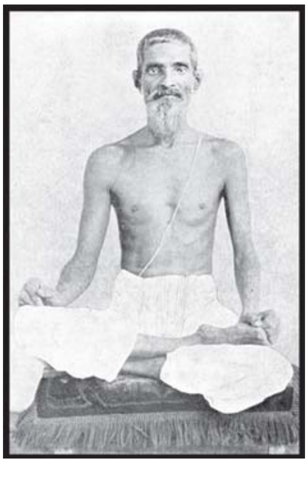

যাহা কিছু সম্পত্তি জীবের আছে, জীবের দেহজনিত অভাব দূর করিবার জন্যই উহার প্রয়োজন হয়, দেহ সদাই অভাবযুক্ত সুতরাং জীব সেই সকল অভাব পূরণের জন্য সম্পত্তিলাভের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, পরন্তু তাঁহার নিকট গেলে দেহও নাই এবং কোন প্রকার অভাবও নাই, সুতরাং তিনি জীবের চিরসম্পত্তি স্বরূপ। তিনি বুদ্ধিস্বরূপ বলিয়া জীব তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নষ্টবুদ্ধি হইলে সে মরিয়া যায় (গীতা ২য় অঃ, ৬৩ শ্লোক দেখ)। তিনি কীর্ত্তিস্বরূপ বলিয়া জীব তাঁহার নিকট গেলে বুঝিতে পারে যে, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের কার্য্য শেষ করিয়া সে তাঁহাতেই নিবৃত্তি লাভ করিতেছে এবং কর্মফলজনিত জন্ম-মৃত্যুর অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, ইহাই কীর্তি —''কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি''। তাঁহার নিকট গিয়া অসতের অস্তিত্ব ঘুচিয়া একমাত্র সৎই স্থায়ীভাবে রহিল ইহা বুঝিলাম, সুতরাং তিনিই নিত্য। তিনি সর্বব্যাপী হইয়াও সর্বত্র এবং প্রতি ঘটে পূর্ণরূপে এবং একইভাবে দৃশ্যমান হয়েন বলিয়া তিনি পূর্ণ (ঈশোপনিষৎ শান্তিপাঠ দেখ)। দূর হইতে তাঁহাকে সাকার ও রূপবিশিষ্ট দেখিতেছিলাম, পরন্তু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে তাঁহার সাকার মূর্তিরূপ ভৌতিকদৃশ্য সূক্ষ্মে বিলয় প্রাপ্ত হইল, তদ্দর্শনে আমারও জড়-আকার আমাকে ছাড়িল, এক্ষণে আমিও নিরাকার, তিনিও নিরাকার। তিনি নির্গুণ বলিয়া জীবের উপলব্ধি হইতেছে — ভাল-মন্দের বিচার থাকিলেই গুণের পরিচয় হয়, পরন্তু যেখানে সবই ভাল, সেখানে মন্দ না থাকায়, গুণনির্দেশকের অভাব হেতু তিনি নির্গুণ, তৎসঙ্গে আমিও গুণবস্তু (জড়দেহ) বর্জিত হইয়া নির্গুণ হইয়াছি। তাঁহাকে স্বাত্মসংস্থিত দেখিতেছি —ভিন্নবস্তুতে সংস্থিতির দ্বারা আমি ভিন্নবস্তুকে আত্মীয় বলিয়া ভাবিতেছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি যে তিনিই সকলের আধারস্বরূপে আছেন এবং তাঁহার আধারস্বরূপে কেহ নাই, সুতরাং তিনি আপনাতে আপনি স্থিতি-সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছেন। এমত শ্রীমৎ গুরুকে আমি বন্দনা করি, তাহার ফলে কি হইল? — আমিও আত্মপদে সংস্থিতি লাভ করিলাম। ৭৮ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

ভাগবৎ-কথা

নদী মাতৃকা গোদাবরী-কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যুগাবসানকালে বালকরূপী শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে তাঁহার উদরে আশ্রয় দান করতঃ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই সময় শ্রীহরির উদরে বহু নদীকে আশ্রিত অবস্থায় দর্শন করেন। তন্মধ্যে পুণ্যতোয়া 'গোদাবরী' নদী অন্যতম।

গোদাবরী নদীর অন্য নাম 'গৌতমী-গঙ্গা'। পুরাণের একটি কাহিনীতে এই নামকরণের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় — মহর্ষি গৌতম একবার গো-হত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। গৌতমের উপাসনায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মহর্ষি গৌতম মহাদেবের নিকট তাঁহার জটাস্থিত গঙ্গা নদীকে মর্ত্যে প্রবাহিত করিবার বর প্রর্থনা করেন। তখন মহাদেব তাঁহার জটায় রক্ষিত গঙ্গানদীকে ব্রহ্মগিরি পর্বতের উপর সংস্থাপন করেন। মহর্ষি গৌতম প্রার্থনা করেন যে, ব্রহ্মগিরি হইতে গঙ্গার পবিত্রধারা ভূপৃষ্ঠে যতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে ততদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ যেন পবিত্র জলের স্পর্শে পরিপূর্ণ কলুষমুক্ত হয়। মহর্ষি গৌতমই গঙ্গার এই পবিত্র ধারাটিকে মর্ত্যে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'গৌতমী-গঙ্গা'। প্রকৃতপক্ষে ইহা গোদাবরী নদী। স্বর্গে বরুণদেবের সভায় যে সব নদী উপযুক্ত মাতৃকা দেহ ধারণ করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোদাবরী অন্যতম। এই নদীর তীরে বহু তীর্থের অবস্থান। পুরাণে গোদাবরী নদীকে সহস্র শিবলিঙ্গ বিশিষ্ট তীর্থ বলা হইয়াছে। গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং বাসুকিলোক লাভ হয়। দক্ষিণ ভারতের এই নদীতীরে বহু মনোরম বনভূমি ও উদ্যান রহিয়াছে। মহাভারতের পাণ্ডবেরা বনবাসকালে একবার গোদাবরী নদীতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন।

গোদাবরী ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা অন্যতম পবিত্র নদী। সহ্যাদ্রি পর্বত ইহার উৎসস্থল। সহ্যাদ্রির উত্তরাংশের যে জায়গাটি হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু পুরাণে সেটিকে অতি মনোরম স্থান বলিয়া উল্লেখিত করা হইয়াছে। সুররাজ গোবর্দ্ধন ওই স্থানেই একটি নগর নির্মাণ করেন। ঋষি ভরদ্বাজও ওই একই জায়গায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্যে পর্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃজন করিয়াছিলেন।

রামায়ণে রামচন্দ্রের বনবাসের স্মৃতি গোদাবরী নদীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে কারণ গোদাবরীর তীরেই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসের স্মৃতিবিজড়িত পঞ্চবটী বনের অবস্থান। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত গোদাবরী এবং তাহার তীরবর্তী অঞ্চলের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীরাম গোদাবরীকে ফুলে-বৃক্ষে সুসজ্জিত সুরম্যা এক নদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই নদীর তীরে হরিণেরা খেলা করিয়া বেড়ায়। এই গোদাবরী নদী সীতাদেবীর অতীব প্রিয় ছিল। লঙ্কাপতি রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিবার জন্য পঞ্চবটীতে আসেন, তখন রাক্ষসকুলপতির ভয়ে গোদাবরী নদীর জল হ্রাসিত হইয়া যায়। অপহৃত দেবী সীতাও গোদাবরী নদীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার অপহরণের সংবাদ রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। ভগবান শ্রীরামও গোদাবরী নদীর নিকট সীতার খোঁজ করিয়াছিলেন। সীতাহরণের পর সুগ্রীব তাঁহার বানর সেনা প্রধানদের সীতাদেবীর খোঁজে বহু নদী ও জনপদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে গোদাবরী নদী অন্যতম।

বেদেও গোদাবরী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে গোদাবরী নদী হব্য বহনকারী পবিত্র অগ্নির উৎসস্থল। সে সময় আর্য্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতীয় মানুষই পবিত্র গোদাবরীর জল পান করিত। অর্থাৎ সকল মানুষেরই উপজীব্য ছিল এই নদী।

গোদাবরী ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। মহারাষ্ট্রের ত্রিম্বকেশ্বরের নিকট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎসারিত গোদাবরী নদী তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ত্র্যম্বকেশ্বর হইতে গোদাবরীর যে শাখাটি প্রবাহিত হইয়াছে স্থানীয়দের নিকট উহা আজও 'গৌতমী-গঙ্গা' নামে পরিচিত। মহর্ষি গৌতম ও গৌতমী-গঙ্গার কাহিনী স্মরণ করিয়া ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকট আজও দ্বাদশ বৎসরান্তে একটি মেলার আয়োজন হয়।

মহর্ষি গৌতম কর্তৃক গৌতমী গঙ্গার মর্ত্যে আগমন কথা :—

ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নির্গতা গঙ্গা দেবী পার্বতীর মতোই মহাদেবের প্রিয় পত্নী। গঙ্গাদেবী সর্বদা স্বামী শিবের জটাজুটে অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি ভগবান শিবের একান্ত অনুরক্তা এবং শিবও গঙ্গার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট আছেন। ইহাতে নিরূপায় পার্বতী স্বামীর উপর অভিমান করিয়া সব মায়া পরিত্যাগকরতঃ হিমালয়ে তপস্যা করিতে যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। পুত্র বিনায়ক-গণেশ তখন মায়ের দুঃখ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন মাতা পার্বতীকে খানিক প্রবোধ দিয়া স্কন্দ-কার্তিকেয় ও মাতৃসখী জয়ার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ঠিক সেই সময় চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপী এক ভয়ংকর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। জলাভাবে, পৃথিবী তখন প্রায় ধ্বংস হইবার অবস্থা। পরন্তু মহর্ষি গৌতম সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগেও প্রাণ হারাইলেন না। নারদ সেই সময় ব্রহ্মগিরিতে এক তপস্যার আয়োজন করিলেন। মহর্ষি গৌতম এই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মগিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় নিজ আশ্রম স্থাপন পূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য ঋষিরাও গৌতমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কারণ প্রকৃতির প্রকোপ হইতে জীবনরক্ষার সেটিই একমাত্র উপায়। বিনায়ক-গণেশও ব্রাহ্মণের বেশে জয়াকে সঙ্গে করিয়া তখন গৌতম-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কারণ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের ক্ষমতা একমাত্র প্রভাবশালী মহর্ষি গৌতমেরই রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণবেশী বিনায়ক কিছুকাল আশ্রমে থাকিবার পর সমবেত অন্যান্য ব্রাহ্মণদের লইয়া অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন গৌতমের নিকট। কিন্তু প্রীতিবশতঃ গৌতম তাঁহাদের আশ্রম ত্যাগ করিতে দিলেন না। বিনায়ক ঋষির অনুগ্রহ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তখন যুক্তি-তর্ক শুরু করিলেন। স্থির হইল যে মহর্ষি গৌতমের মাধ্যমে বিনায়ক এমন কার্য্য সমাধা করিবেন যাহার ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইবে। গণেশ মায়ের অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া জয়াকে নির্দেশ দিলেন গোপনে গো-রূপ ধারণ করিয়া গৌতম ঋষির সম্মুখে তাঁহার আশ্রম সংলগ্ন ক্ষেতে শালিধান ভক্ষণ ও নষ্ট করিতে হইবে। গৌতম তাঁহাকে সামান্যতম তাড়না করিলে আর্তস্বরে তিনি যেন মাটিতে জীবন্মৃতের মত পড়িয়া থাকেন। তখন গো-রূপী জয়া অবিলম্বেই নির্দেশমত কাজ করিলেন। মহর্ষি গৌতম কর্তৃক ধাবিত গাভীটিকে মৃত ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ গো-হত্যার পাপের কারণে তপার্জিত ক্ষমতা ক্ষয় হইবার ভয়ে আশ্রম ত্যাগে উদ্যোগী হইলেন। তখন গৌতম জীবন্মৃত গাভীটির নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে বিনায়কের শরণাপন্ন হইলেন। গণেশ তখন তাঁহাকে বলিলেন — মহাদেবের জটাজুট হইতে তপস্যাবলে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়া গাভীটিকে পবিত্র জলে অভিষিক্ত করিলেই তাঁহার নিষ্কৃতি হইবে। মহর্ষি গৌতম শেষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া গৌতমী-গঙ্গার মর্ত্যে আগমন নিশ্চিত করেন।

(*ব্রহ্মপুরাণ হইতে সংগৃহীত*)

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গেঃ—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

১১। (পত্র নং ১১)—(প্রথম ভাগ) জগতে যে সকল আধ্যাত্মিক মার্গ যোগমার্গ বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সবগুলিকেই আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে যোগমার্গ বলা চলে না। অধিকাংশই সাধন মার্গের প্রকারভেদ মাত্র। কোনো কোনোটিতে যোগের সম্বন্ধও থাকিতে পারে। সাধন মার্গে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি আছে। যোগ পথেও আছে; কিন্তু উভয়ের পার্থক্য অতি স্পষ্ট। বৌদ্ধদিগের হীনযান পথটি সাধন পথ এবং মহাযান পথটিকে যোগপথ বলা চলে। আমাদের ষড়দর্শন অনুসারে অনুশীলন প্রণালী সবগুলিই সাধন পথ। এমনকি প্রচলিত বেদান্ত সাধনও সাধন, যোগ নহে। পাতঞ্জল যোগও সাধন, যোগ নহে — এই বিষয়ে শ্রীমার মতামত।

উত্তর — (পত্র ১১, প্রথম ভাগ) — সাধন ও যোগ বিষয়টির পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া কবিরাজ মহাশয় বৌদ্ধ ধর্মের 'হীনযান' পথটিকে সাধন পথ এবং 'মহাযান' পথটিকে যোগপথ বলিয়াছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে হীনযান কি এবং মহাযান কি। হীনযানীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে বলিয়া তাহাদের সর্বাস্তিবাদী বলা হয়। অপরপক্ষে মহাযানীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। হীনযানীরা হল Realists বা বস্তুবাদী এবং মহাযানীরা হল ভাববাদী বা Idealists; মহাযানীরা শূন্যবাদ ও যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের মতবাদ গ্রহণ করেন। হীনযানীদের দর্শনানুযায়ী বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না (সৌত্রান্তিক)। তাহা অনুমান সাপেক্ষ; আবার হীনযানেরই অন্যবাদে, বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় (বৈভাষিক)। মহাযানী হল ভাববাদী, যেটি দুইভাগে বিভক্ত — (১) যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ), (২) মাধ্যমিক (শূন্যবাদ)। বৌদ্ধদর্শনের ঐ দুই পন্থাকে - হীনযানকে সাধন পথ এবং মহাযানকে যোগপথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন শ্রীকবিরাজ মহাশয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅক্ষয় দত্তগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'জ্ঞানগঞ্জ' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন — ''মোট কথা সাধন বিনা সিদ্ধি নাই। হীনযান মতে বুদ্ধ পথ দেখাইয়াছেন মাত্র, সাধককে নিজের চেষ্টায় চলিতে হইবে। মহাযান মতে বোধিসত্ত্ব আরও একটু কাছে আসিয়া এবং নিজের অনন্ত পুণ্যেরও ভাগ করিয়া দিয়া একটু অধিক সাহায্য করেন। কেন না তিনি ধ্যানী বুদ্ধের কৃপাবতার। মহাযানের আদর্শ স্বতন্ত্র। সে আদর্শ হইতেছেন বোধিসত্ত্ব। 'বোধিসত্ত্ব', এই শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ। একটি হইতেছে, যিনি বহু বহু জন্ম ব্যাপী সাধন দ্বারা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা এই ছয়টি গুণের বা ধর্মের পারমিতা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া বুদ্ধত্বে সন্নিহিত হইয়াছেন কিন্তু জগতের সকল জীবের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া অপার করুণাবশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যতদিন একটি জীবও নির্বাণে বঞ্চিত থাকিবে ততদিন তিনি বুদ্ধত্ব বরণ করিবেন না, সকল জীবের শ্রেয় সাধনে ব্যাপৃত থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, মহাযান মতবাদের উচ্চতম তত্ত্ব হইতেছেন ধ্যানী বুদ্ধ; ইনি মানুষ বুদ্ধ নহেন। বোধিসত্ত্ব সেই ধ্যানী বুদ্ধেরই অবতার জগতের পূর্বোক্ত রূপ শ্রেয়ঃ সাধনার্থ তৎকর্তৃক বুদ্ধত্বের কিঞ্চিৎ নিম্ন অবস্থায় প্রতিষ্ঠাপিত। কার্য্যতঃ দুটি অর্থেরই সমন্বয় করিয়া বোধিসত্ত্বাদর্শের ধারণা ও বিচার করা হয়। একদিকে নীচ হইতে উর্দ্ধে উত্তরণ, অন্যদিকে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণ প্রত্যেকে সাধন দ্বারা উন্নত হইয়া নিজেদের মোক্ষ বা নির্বাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জগদুদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই বোধিসত্ত্বের সমতুল্য।''

যোগসাধন পথে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উত্তরণই হইল 'যোগ'। ঐ যোগ অবস্থা হইতে ক্রমান্বয়ে সাধক যোগী হইয়া নির্বাণ পদ লব্ধ হন আর বোধিসত্ত্বগণ 'যোগ' হইতে অবতরণ করিয়া সদ্‌গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া লোককল্যাণ নিমিত্ত মানুষকে সাধন পথ প্রদর্শন ও দীক্ষাদানের মাধ্যমে শিষ্যকে চৈতন্যশক্তি দান করিয়া জন্মজন্মান্তরে নির্বাণ পদে উত্তোলিত হইবার সাধনপথ, প্রদর্শন করেন। জ্ঞানগঞ্জের মহাতপা মহাশয়কে, মহাযোগাসীনা ধ্যানীবুদ্ধ মনে করিলে তাঁহার শক্তি ও প্রভাব বোধিসত্ত্ব স্থানীয় ভৃগুরামাদি পরমহংস মধ্যে যে অবতরণ করিয়াছে, অবশ্যই ইহা অনুমেয় — এই পর্য্যায়টি উর্দ্ধ হইতে

নিম্নে অবতরণের অর্থাৎ অবতারের কর্ম। অতএব অবতারের কর্মকেই 'যোগমার্গ' বলা যায়। যোগীশ্বরের কর্মপন্থাই হইল যোগমার্গ। সাধকের সাধন পাদ হইল সাধনমার্গ, যেখানে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি আছে — ইহা আত্মজ্ঞান-উপলব্ধির পর্য্যায় পড়ে। আর যোগপথে যে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি তা হল যোগীর স্বপ্রকাশ স্বভাব মাত্র। তাই বলা হইয়াছে অনুশীলন প্রণালী সবগুলিই সাধন পথ, সাধকের পথ যোগে উপনীত হইবার প্রয়াস। আর 'যোগ' হইল উপযুক্ত বিশুদ্ধ সত্তাধারে তাঁহার সদ্‌গুরুর শক্তি পরমাণু আরোপ করিবার ফলে আত্মজ্ঞ শিষ্যের আধারে হয় পূর্ণত্বের জাগরণ অর্থাৎ শিবত্বের পূর্ণরূপ।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(৭)

শ্রীশ্রীমায়ের কথা — ভগবতী শ্রীরাধার বিষয়ে :— রাধাষ্টমী তিথি - ইং ৬-৯-২০১৯

শ্রীরাধা মূলা হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তিরই সর্ব আনন্দাতিশায়িনী বৃত্তি ভক্তগণের চিত্ত মাঝে হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভগবৎপ্রীতি রূপে ভক্তের সত্তা মধ্যে বিরাজ করে। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহের বীজ বা উৎপত্তি স্থল বলা হয়েছে। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে শৌনক-নারদ সংবাদে জানতে পারা যায় যে 'শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়া জেনে শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করেন।' স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও শ্রীভগবান যে শক্তির দ্বারা স্বয়ং আনন্দ-আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ আস্বাদন করান, সেই শক্তিকেই হ্লাদিনী শক্তি বলে। সেই হ্লাদিনী শক্তির পরমসার রূপই 'শ্রীরাধা'। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে —''হ্লাদিনীর সার হল 'প্রেম'; প্রেমের সার হল 'ভাব'। ভাবের পরাকাষ্ঠার নাম 'মহাভাব' আর সেই মহাভাবের স্বরূপে হলেন 'শ্রীরাধা ঠাকুরানী', সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি।'' ভগবতী 'রাধা' হলেন যোগমায়া আর ভগবতী 'দুর্গা' হলেন মহামায়া। 'রাধা' নিবৃত্তি মার্গে অবস্থান করেন, আর গতিপথে তিনিই 'ধারা' রূপে মহামায়া স্বরূপিণী ললিতা-দেবী-দুর্গা সাধকগণের মোক্ষদায়িনী। দেবী রাধা মঞ্জুস্বভাবা, মধুর স্নিগ্ধ স্বভাবযুক্তা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, সখী-মঞ্জরীগণের প্রতি আর বিশ্বজীবের প্রতি এই মঞ্জুস্বভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যেমনভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে তদনুরূপই কৃপা করে থাকেন। কিন্তু মঞ্জুস্বভাবা শ্রীরাধা বিশ্বজীবের প্রতি অবিচারে কৃপা করে থাকেন; শ্রীরাধা জীবের প্রতি অবিচারে প্রেমদান করেন, এটিই তাঁর দিব্যস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধা হলেন প্রেমের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শ্রীরাধা নাম শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী মহামন্ত্র; কারণ, শ্রীরাধার মধ্যে যে আনন্দধারা রয়েছে সেটি সহজ এবং অদ্ভুত। সহজ এইজন্য যে, সেই প্রেমানন্দ-ধারা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানগন্ধশূন্য শুদ্ধ মাধুর্য্যময়, তাই সহজ এবং স্বাভাবিক। আবার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যময় কারণ সেটি চমৎকারিতায় পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে সুখের সঞ্চার করাই মহাভাবের কার্য্য। সব ব্রজগোপীগণের মধ্যে মহাভাবের বৃত্তি প্রচুর বিদ্যমান থাকলেও শ্রীরাধা মহাভাবের সারাংশ-উদ্রেকময়ী। শ্রুতিতে 'আনন্দং ব্রহ্ম' 'আনন্দমমৃতং যদ্বিভাতি' 'আনন্দ ব্রহ্মণো রূপং' ইত্যাদি ব্রহ্মের যে আনন্দরূপতা নির্ণীত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণই সেই আনন্দের কন্দ বা মূল, কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান। সেইরূপ শ্রীরাধা আনন্দকন্দ শ্রীভগবানের পরম অদ্ভুত সৌম্যালক্ষ্মী। শ্রীরাধা হলেন পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগরসের দিব্য মূর্তি। 'রাধা' সর্বগুহ্যতম দিব্য-উপলব্ধির বিষয় মহাভাবরস সার। তাই 'রাধা' নাম জপে সিদ্ধ-যোগী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সহজেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীরাধা অনন্ত গুণময়ী, শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত গুণময়। দুজনেই একে অপরের সম্পূরক ও সমরস্যতা প্রাপ্ত পরমব্রহ্মস্বরূপ সত্তা। পরমব্রহ্ম সত্তার 'গুণ' বলতে নির্গুণে-সগুণ, সগুণে-নির্গুণ মিলমিশ্রণে থাকা অবস্থায় স্বভাবের অনন্ত স্ফূরণ বোঝায়। পুরাণ শাস্ত্রে আছে, রাধাকৃষ্ণের ভক্তগণ 'রা' শব্দ উচ্চারণ মাত্রই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় এবং অন্ত্যবর্ণ 'ধা' শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই হরির পদে ধাবমান হয়। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম অনঙ্গমোহন। সেই অনঙ্গমোহনের ইচ্ছামাত্রেণ বামাঙ্গ হতে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্না হন। অন্যান্য দেবগণের স্ত্রীগণ তাঁরই অংশে উৎপন্না হয়েছেন।

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩৮)

দেবতা ইন্দ্র — (পূর্ব প্রকাশিতের পর....)

ইন্দ্রের আয়ুধ হল বজ্র। পুরন্দর বজ্রপাণি। ঋগ্বেদের অনেক ঋষিই তাঁর বজ্রায়ুধের কথা বলেছেন। আকাশের বিদ্যুৎ চমক তাঁর হাতের বজ্র বলে কল্পিত হয়েছিল। ইন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য ত্বষ্টা এই বজ্র নির্মাণ করে তাঁকে দিয়েছিলেন (ঋক্ সং ১/৩২/২), অপর মতে কাব্য উশনা এর নির্মাতা (ঋক্ সং ১/১২১/১২)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অবশ্য (৪/১) দেবতাদের বজ্রনির্মাতা বলা হয়েছে। বেদে কোথাও বজ্রকে আয়স (ঋক্ সং ১/৫২/৮) বা ধাতু নির্মিত বলা হয়েছে, অন্যত্র আবার বলা হয়েছে যে তা হিরণ্ময় (ঋক্ সং ১/৫৭/২)। এটি উজ্জ্বল (ঋক্ সং ৩/৪৪/৫) চতুর্ধার (ঋক্ সং ৪/২২/২) শতধারা (ঋক্ সং ৪/১৭/১০) শতমুখ বা সহস্রমুখ (ঋক্ সং ১/৮০/২২)। বৃষ যে ভাবে তার শৃঙ্গ ঘর্ষণ করে ইন্দ্রও তেমনি তাঁর বজ্র ঘর্ষণ করেন (ঋক্ সং ১/৫৫/১)। ইন্দ্রের হস্তকে আকাশের বজ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে —'দিবে ন সূর্যঃ'। বজ্রের ধারণকর্তা হিসাবে ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে বজ্রবাহু, বজ্রিন, বজ্রহস্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ইন্দ্রের হাতে তীর ধনুকের কথাও পাওয়া যায় (ঋক্ সং ৮/৪৫/৪, ১০/১০৩/২)। তাঁর হাতের অস্ত্র হিসাবে হাতীদের চালনা করার জন্য অঙ্কুশ নামক অস্ত্রের কথাও (ঋক্ সং ৮/১৭/১০) বলা হয়েছে। ইন্দ্রের বাহন যদি হস্তী হয় তাহলে অবশ্যই তাঁর হাতে অঙ্কুশ থাকতে হবে। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে (৮/৮/৫/৮) ইন্দ্রের হাতে জালের কথাও আমরা পাই।

দেবরাজ ইন্দ্র অতি দ্রুতগামী রথে চড়ে ঘোরেন। তাঁর রথকে মনের থেকেও দ্রুতগামী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (ঋক্ সং ৬/২৯/২, ১০/১১২/২)। তিনি রথে চড়ে যুদ্ধ করেন এবং হরিদ্বর্ণ অশ্বিদ্বয় সেই রথ বহন করে। বিভিন্ন সূক্তে তাঁর বাহনের সংখ্যার হিসাব বিভিন্ন রকম। কোথাও শত, কোথাও এগারশত আবার কোথাও বা হাজার (ঋক্ সং ২/১৮/৪-৭, ৪/৪৬/৩, ৬/৪৭/১৮, ৮/১৯/২৪)। এই অশ্বগুলি হিরণ্যকেশর (ঋক্ সং ৮/৩২/২৯), ময়ূরের মত তাদের পুচ্ছের বর্ণনাও আছে (ঋক্ সংহিতা ৩/৪৫/১)। ঈগলের মত তারা যেন পাখায় ভর করে দ্রুত উড়ে চলে (ঋক্ সং ২/১৬/৩, ৮/৩৪/৯)। ইন্দ্রের জন্য রথ আর রথের ঘোড়াদের চালনার জন্য স্বর্ণকষা বা সোনার চাবুক নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ঋভুরা (ঋক্ সং ১/১১১/১)।

ইন্দ্র দেবতা সোমপ্রিয় বা সোমপা, তাই সোমপানের জন্য তিনি তা চুরিও করেন (ঋক্ সং ৩/৪৮/৪, ৮/৪/৪)। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই কেবল সমস্ত সোম পান করতে পারেন (ঋক্ সং ৮/২/৪)। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সোমপান করেছিলেন (ঋক্ সং ৩/৪৭/২-৩)। বৃত্রকে বধ করার আগে সোমপান করে ইন্দ্র শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। বৃত্র বধে পরিতৃপ্ত মানুষেরাও তাঁকে সোমরস প্রদান করে আপ্যায়িত করেন। ঋগ্বেদের ১/৪/৭-৮ মন্ত্রে পাই — এই সোমরস ব্যাপনশীল যজ্ঞের সম্পদস্বরূপ, তা মানুষকে হৃষ্ট করে, কার্যসাধন করে এবং তা হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা। যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে সোমদান কর।

ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞেও ইন্দ্রের সোমপানের কথা ঋগ্বেদের ২/১৫/১ মন্ত্রে পাওয়া যায়। সোম প্রকৃত পক্ষে কোন মাদকদ্রব্য অথবা অন্যকিছু একথা আমরা সোমসংক্রান্ত আলোচনার সময় উপন্যস্ত করব। ইন্দ্র সোম যেমন পান করতেন তেমনি গো-মহিষের মাংসও তার সঙ্গে খেতেন। এগুলিও তাঁর প্রিয়বস্তু। বসুক্র ঋষি ঋক্ সংহিতার ১০/২৮/৩ মন্ত্রে বলেছেন —

'অদ্রিণা তে মন্দিন্ ইন্দ্র
তুয়ান্‌ত্সুন্বন্তি সোমানপিবসি ত্বমেষাম্।
পঞ্চতি তে বৃষভাঁ অৎসি
তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূয়মানঃ।।'

অর্থাৎ — 'হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশ্যে হোম করা হয়, তখন তারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতা শক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে। তুমি তা পান কর। তারা বৃষভসমূহ পাক করে তুমি তা ভোজন কর।' দশম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ১৩ ও ১৪ মন্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে কুড়িটি বৃষ রান্নার কথা আছে। এসব ছাড়াও ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবি, পুরোডাশ, ঘৃত ও নানা ওষধি আহুতি দেবার কথা আছে।

সোমপানের দ্বারা পরিতৃপ্ত ইন্দ্র বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের হনন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় ভক্ত যোদ্ধাদের তিনি রক্ষা

করেছিলেন। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ থেকে জানি সোমপান করার ফলে তাঁর উদর স্ফীত হয়ে গিয়েছিল। ঋগ্বেদের ১/৮/৭ মন্ত্রে ঋষি বলেছেন — সোম পান করে ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের মত বর্ধিত হতে থাকে —'যঃ কুক্ষি সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। উর্বীরাপ ন কাকুদঃ' (ঋক্ সং ১/৮/৭)। প্রথম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে ঋষি বলেছেন — অনেক সোমপান করার ফলে ইন্দ্রের শ্মশ্রু সোমলিপ্ত হয়ে যায়, সোম ঝেড়ে ফেলে আবার সোম পানের জন্য ইন্দ্র অগ্রসর হন।

ইন্দ্রের হাতের অস্ত্র হিসাবে বজ্রের কথা আমরা আগেই বলেছি —'ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ', ইন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কাজ করেন তাঁর বজ্রের দ্বারা, তাই বহু লোক তাঁর স্তুতি করে থাকে —'ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ' (ঋক্ সং ১/১১/৪)। শিল্পী ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য এই বজ্র নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং বহু সংগ্রামে তাঁর কার্যসাধক ছিল এই বজ্র। বৃত্র, শুষ্ম প্রভৃতি অসুরকে এর সাহায্যেই বধ করেছিলেন ইন্দ্র —

'ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ত্।
ধত্ত ইন্দ্রো নর্যপাংসি কর্তবেহহন্বৃত্রং নিরপা সৌব্জদর্ণবম্।।'

(ঋক্ সং ১/৮৫/৯)

....ক্রমশঃ

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতা ভাবনা

(৪০)

গীতা ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ব :—

(...পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বস্তুতপক্ষে গীতায় আত্মার অমরতার কথা এবং নিষ্কাম কর্মযোগের কথা সংগ্রামীদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের একটা চিঠির কথা অধ্যাপিকা সুজলা কুণ্ডু উদ্ধার করেছেন তাঁর 'শ্রীমদ্ভাগবৎগীতার প্রভাব' গ্রন্থে (১০২ পৃঃ) — ''আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি — আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, 'আমিই সে' — আগুন আমাকে পুড়াইতে পারে না, জল আমাকে ভিজাইতে পারে না। আমি অজর, অমর, অব্যয়।'' এই কথাটা যে গীতার ২/২৩,২৫ শ্লোকের কথা তা নিশ্চই পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। ফাঁসির আগে মায়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে মৃত্যুকে ইনি মিত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অধ্যাপিকা কুণ্ডুর মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই বক্তব্যটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হবে —''প্রতিটি বিপ্লবীর সর্বোচ্চ নেতা হইতে নিম্নতম সৈনিক পর্যন্ত সকলের জীবন-দর্শনটি ছিল গীতার ছকে বাঁধা। নিত্যকর্ম হিসাবে অধিকাংশই গীতা পাঠ করিতেন তো বটেই - না করিতে পারিলেও গীতার অনাসক্ত কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন বীরব্রতে, আত্মার অবিনশ্বরতায় গীতার আস্থা লইয়া জীবনে প্রতিটি ক্ষণ কথা কহিয়াছেন তাঁহারা। যতীন্দ্রনাথ (বাঘাযতীন), সূর্য সেন (মাস্টার দা), জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (মাস্টারমাশাই), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবর্গ — যাঁহারা আমরণ বিপ্লব সাধনায় মগ্ন ছিলেন, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন আধ্যাত্মিকতার আলোকে উজ্জ্বল ছিল এবং তাহার মূল শিখাটি ছিল 'শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা' (১০৩ পৃঃ)।

অতুলচন্দ্র সেন 'বাংলার বিপ্লববাদ ও গীতা' নিবন্ধে বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে সেই সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন। গীতার সম্পাদনায় লেখা (৬৩ পৃঃ) প্রবন্ধটির কিছুটা উদ্ধার করলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে —'কানাই - ক্ষুদিরাম - প্রফুল্ল চাকী - সত্যেন্দ্র বসু - নলিনী বাগচী - প্রীতিলতা - আসফাকউল্লা - বসন্ত - বিলাস - বিনয় - বাদল - দীনেশ - ব্রজকিশোর - অনাথপাঞ্জী - প্রদ্যোৎ - মৃগেন্দ্র - যতীন দাস - মতি মল্লিক - ভবানী - উধম সিং - রামকৃষ্ণ - নির্মল সেন - দীনেশ মজুমদার - ভগৎ সিং প্রমুখ অসংখ্য শহিদদের প্রত্যেকে সেই যুগে একটি বাণীর মর্মকথা হৃদয় দিয়ে শুনেছিলেন।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বসে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ২/৬১

তাই এই অপরিণত মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী সকল ইন্দ্রিয় সংযম করে চিত্ত সমাহিত করতে চেয়েছিলেন, ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করেই ক্রমে তাঁরা 'সমাহিত চিত্ত' হতে পেরেছিলেন। নিঃশব্দে আত্মদান করে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন যে তাঁরা ছিলেন

'স্থিতপ্রজ্ঞ'। বিপ্লবীদের জীবনকথা যাঁরা পর্য্যালোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই এই দিকটার উপরে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এই বিপ্লবীদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী একটি গীতাভাষ্যও লিখেছিলেন। ইংরাজ সরকার এইসব বিপ্লবীদের যখন কারারুদ্ধ করতেন তখন তাঁদের সব রকমের কাগজপত্র যেমন বাজেয়াপ্ত করতেন তেমনি গীতা রচনাদিও বাজেয়াপ্ত করতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্য মহারাজকে যখন জেলে পাঠান হল তখন তাঁর গীতাভাষ্য লেখা খাতাটাও কর্তৃপক্ষ কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর খাতাগুলো যখন ফেরৎ দেওয়া হল, তখন গীতার প্রথম অধ্যায়ের বিষয় তিনি প্রকাশ করলেন 'গীতার ১ম খণ্ড' নামে। ১৯৩০ সালে আবার তাঁকে ধরা হল এবং নয় বছরের জন্য জেল দেওয়া হল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি গীতার পরবর্তী অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন। পণ্ডিতেরা যেভাবে সব সময় গীতার শ্লোক আওড়ান ইনি কিন্তু তেমনটি করতেন না, অথচ গীতার বাণী তাঁর মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল।

রাইটার্স বিল্ডিঙে অলিন্দযুদ্ধে দীনেশ গুপ্ত ব্রতী হন এবং বীরের মত মৃত্যুকেও বরণ করেন। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় দীনেশের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন —"গীতা পড়তে আমার ভাল লাগে, কিন্তু দু-লাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তক্ষুণি ভাবতে বসি কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি যুদ্ধের সৈনিক হব।"

৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে বালেশ্বর যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রভৃতি প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন। পরে বালেশ্বর জেলেতেই নীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির দুদিন আগেই ১লা ডিসেম্বর বালেশ্বর থেকে মনোরঞ্জন তাঁর ছোট ভাই চিত্তরঞ্জনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেখান থেকে তাঁর বিপ্লববাদের পটভূমিতে গীতার ভূমিকাটি ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাপিকা কুণ্ডু পঞ্চানন চক্রবর্তীর লেখা 'রক্ততীর্থ' থেকে (৫৬ পৃঃ) সেই চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন। সেখান থেকেই আমরা চিঠিটি তুলে দিলাম।

স্নেহের ভাইটি,

আগামী পরশু আমার জীবনের বিজয়া দশমী, হৃদয়ে বাসনার বীজ থাকে বলেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়, আমাদেরও কামনা পূর্ণ হয়নি তাই আমিও হয়তো তোমার ছোটভাই হয়ে জন্মেই প্রারব্ধ কাজের বাকিটুকু শেষ করব। এটুকু বিশ্বাস আমার খুবই আছে যে আমরা আমাদের লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছাব, সেই দিনের আর বেশী দেরী নাই। মনে করিও না এই জীবন-দান নিরর্থক। আমাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিও না। জান তো —

দেহিনোঽস্মিন্ তথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।

সকল জিনিসের মধ্যেই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত থাকে। ভগবান প্রাণের আকুল আগ্রহ কোন দিনই ঠেলে ফেলেন না এবং যা তিনি করেন সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন এটা মনে রেখ। তোমাকে আমি বহুদিন বলেছি, আজও শেষ দিন বলে যাচ্ছি যে এক গালে চড় দিলে তাকে দুই গালে দুইটা চড় দিবে। বাবা, মা, দিদি, দাদা, বৌদিকে সান্ত্বনা দিও। আশীর্বাদ করি ভগবান যেন তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট না করেন।

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রংহৃদয়দৌর্বল্যম্ ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।

ইতি - নোয়াদা।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে গীতা শুধুমাত্র একটা ধর্মশাস্ত্র ছিল না, তা ছিল দিব্য বাণী, ভগবানের দৈবী প্রেরণা হল গীতা। এজন্য বুঝে হোক, না বুঝে হোক অথবা ভাবাবেগে স্বল্প বুঝে হোক গীতার আস্বাদ তাঁরা হৃদয়ভরে নিয়েছিলেন। এই শাস্ত্রবিশ্বাস একদিনে তাঁদের মধ্যে শান্তি-তৃপ্তি এনেছে দৃঢ়ব্রত করেছে। অপর পক্ষে নিঃশেষে জীবনদানে উৎসাহ যুগিয়েছে। জীবনের পরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ না হলে বার বার জন্মমৃত্যুর যাতায়াত চলতেই থাকবে। প্রতিজন্মেই দেশদ্রোহীদের নিধনের জন্য তাঁরা নানা মূর্তিতে অবতীর্ণ হবেন। যখন অত্যাচারীর শাণিত কৃপাণ ভীম রণভূমে আর রণিত হবে না তখনই বিপ্লবীর সিদ্ধি। দেশের বৃহৎ স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে মিলিয়ে নিষ্কামকর্মে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। গীতার সূত্রে তাই বিপ্লবীদের সহস্রটি মন একই সূত্রে বাঁধা পড়ে ছিল।

গীতা নিয়ে আমাদের পরিক্রমার পথটি বিশাল। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পথের গতিকে বোঝার জন্য যত ব্যাপক আলোচনার দরকার ছিল তত সময় বা বক্তব্য বিষয়কে বিতত করার সুযোগ স্বল্প। প্রতি বিপ্লবী ধরে আলোচনায় না গিয়ে অধ্যাপিকা কুণ্ডুর ধারাকে অনুসরণ করে আমরা এই বিষয় একটা রেখাচিত্র মাত্র অঙ্কন করলাম। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় তোমরা চলেছ?

(স্বামী মুক্তানন্দ রচিত ইংরাজী পুস্তক 'Where Are You Going' -এর বঙ্গানুবাদ)

(৬)

কুকুরের হাড় চিবানো — সুখ আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে এবং এটা আমাদের নিজস্ব, কিন্তু আমরা সর্বদা আমাদের অন্তরানন্দকে বাইরের কোনো কিছুর উপর আরোপ করি এবং ভাবি এটা ওখান থেকেই আসছে। যদি তুমি তোমার ক্রিয়াকলাপ খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার কর, তুমি দেখবে যে এমনকি তোমার পার্থিব আনন্দ উপভোগ্য বস্তুর থেকে আসছে না, তোমার ভিতর থেকেই আসছে। তুমি বলবে, আমি যখন গান শুনি আমার খুব ভাল লাগে। টেনিস খেলাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ পাই। বস্তুতঃ, যখন তুমি এইগুলি কর, এটা তোমার নিজ অন্তঃআনন্দ, যেটা তুমি উপভোগ কর। বেদান্তে একটা প্রবাদ আছে, "পৃথিবীর আনন্দ কুকুরের হাড় চিবানো।" একটা কুকুর একটা হাড়ের টুকরো পেল এবং চিবাতে আরম্ভ করল, চিবাতে চিবাতে একখণ্ড হাড় তার মাড়িতে আটকে গেল এবং রক্ত বের হতে লাগল। রক্তের স্বাদ পেয়ে কুকুরটি ভাবল, 'বাঃ! হাড়ের টুকরোটি তো বেশ সুস্বাদু।' যতো সে হাড় চিবায় ততোই মাড়ির থেকে রক্ত পড়তে থাকে। যতোই রক্তের আস্বাদ পেতে থাকে ততোই হাড়টাকে সুস্বাদু বোধ হতে লাগে। এটা একটা অনন্ত চক্র। যেমন কুকুরটি বোঝে না, যে সে তার নিজ রক্তই আস্বাদন করছে, সেই রকম তুমিও বোঝো না, যে আনন্দ তুমি এই পৃথিবীর থেকে লাভ করছ সেটা তোমার অন্তর থেকেই আসছে। তোমার জীবনে যে আনন্দ তুমি পাও সেই সম্বন্ধে তুমি চিন্তা কর। কোথা থেকে এটা আসছে? যখন তুমি খাওয়া শেষ কর, এবং যখন তোমার উদর পূর্ণ হয়, ক্ষণিকের তুমি তৃপ্তি লাভ কর। যখন তুমি বহুদিন পর তোমার বন্ধুকে দেখ এবং আলিঙ্গন কর, মুহূর্তের একটা ভগ্নাংশ হলেও তুমি একটা আনন্দ উপভোগ কর। যখন শিল্পী তার কাজের বিষয় ভাবে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও সে একটা তৃপ্তি লাভ করে। বস্তুতঃ সে মুহূর্তে যেটা হয় সেটা হল মন তখন শান্ত হয়ে যায়, এবং অন্তরে শান্তির / আনন্দের যে কেন্দ্র আছে বিদ্যুতের চমকের মত, নিজের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। যে আনন্দ তুমি অনুভব করলে সেটা চিরস্থায়ী হয় না এবং এটা অন্তরে একটা আনন্দের ছায়া মাত্র। এই আনন্দ প্রত্যক্ষভাবে পেতে গেলে তোমাকে ধ্যানের মধ্যে যেতে হবে, আনন্দ যেখানে আছে, সেখানেই তাকাতে হবে।

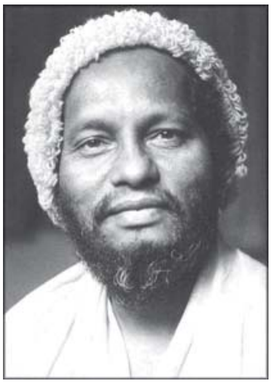

আসল সমস্যা হচ্ছে যে তুমি তোমার অন্তরে তাকাতে চাও না। বাইরের জগতে যা কিছু ঘটছে তোমার ক্যামেরায় শুধু সেগুলিই ধরা পড়ে। অন্তর্লোকে ফিরে ওখানে কি হচ্ছে তার খবর একবারও নাও না। তবু প্রত্যেক রাত্রে অন্তর্মুখী হবার আনন্দ তুমি অনুভব কর। সারা দিনে কত জিনিস সংগ্রহ কর, কত বন্ধুদের দেখ, কত কঠোর শ্রম কর, কত সুখ উপভোগ কর। তুমি এই সমস্তই কর আনন্দের জন্য কিন্তু দিন শেষে যখন বাড়ি আস বল "আমি খুব ক্লান্ত"। সমস্ত দিনে তুমি লক্ষ টাকা আয় করলে, কি উচ্চতম উপাধিতে ভূষিত হলে বা জাঁকজমক পূর্ণ ভোজসভায় গেলে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, যখন দিন শেষ হয়, তুমি শ্রান্ত বোধ কর, তখন যেটা তুমি চাও সেটা হল নিদ্রা। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রম করে যে সম্পদ তুমি সংগ্রহ করলে, ঘুমের সময় এগুলির কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সেই সময় তোমার প্রিয়জনকেও চাও না। যা তুমি চাও সেটা হল বিশ্রাম। সেই জন্য তুমি অন্ধকার ঘরে যাও এবং গরম কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে নাও।

পরের দিন, যদি কেউ তোমাকে প্রশ্ন করে, "কেমন বোধ করছ?" তুমি বল, "আমি খুব সতেজ অনুভব করছি"। কয়েক ঘন্টার ঘুম তোমাকে পূর্ণ সতেজ করে তুলেছে। তুমি কিছু খাওনি, কিছু করনি, কিছু আননি, অথবা কোনো কিছু উপভোগ করনি, তথাপি তুমি পুনঃ তারুণ্যের অনুভব কর। এইটাই তোমার প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতা। কেন সমস্ত দিনে যে সমস্ত কাজ কর্ম করে তুমি আনন্দ পাও সেগুলি তোমাকে ক্লান্ত করে, আবার কয়েক ঘন্টার নিদ্রা তোমাকে এত শক্তিমান এবং কর্মঠো করে তোলে? তোমার নিজের নিদ্রাই তোমাকে বার বার শিক্ষা দেবে যে, সত্যকারের শক্তি এবং ক্ষমতার উৎস তোমার নিজের মধ্যেই আছে।

অন্তঃজগৎ — সমস্ত দিনের মধ্যে যদি আত্মস্থ হও এবং কিছুক্ষণের জন্যও ধ্যান কর, তুমি মূল উৎসটা ধরতে পারবে,

এবং তুমি একটা প্রবাহমান আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে থাকবে। প্রত্যেকের অন্তরে একটা দিব্য সচেতন শক্তি আছে তাকে কুণ্ডলিনী বলে ধ্যানের মধ্যে এই অন্তঃশক্তি জাগরিত হয়, এবং ভিতরে একটা স্বতঃস্ফূর্ত যোগের ক্রিয়া ঘটতে থাকে। অধিকাংশ লোকেই হঠযোগের দৈহিক ক্রিয়াকলাপকেই যোগ ভাবে। কিন্তু যোগের প্রকৃত অর্থ -'পুনঃমিলন' - এই মিলন হচ্ছে আত্মার সঙ্গে, যার সঙ্গ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ। যখন অন্তঃশক্তির জাগরণ হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত যোগের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তোমার মধ্য থেকেই পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে ওঠে। তোমার সচেতনতা অন্তঃমুখী হয় এবং তুমি অন্তঃজগৎ দেখতে সক্ষম হও। বস্তুতঃ ধ্যানের মধ্যে দিয়েই অন্তঃশক্তি জাগরণের পর তুমি তোমার সত্য প্রকৃতিকে, তোমার অন্তঃচেতনাকে চিনতে পার। তুমি এমন একটা কেন্দ্রে পৌঁছাবে যেটা নাকি সুখ দুঃখের অতীত একটা রাজ্য, সেখানে তুমি একটা পরম শান্তির অনুভব করবে এটাই আত্মার রাজ্য।

যখন তুমি আত্মাকে দেখবে, যখন তুমি একে অনুভব করবে, তুমি তখন সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে। পৃথিবীও তোমার কাছে বদলে যাবে, এবং এই পৃথিবীকে তুমি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। একটা প্রবাদ আছে, "কাকের যেটা দিন, প্যাঁচার কাছে রাত্রি"। এইভাবেই, যে পৃথিবীটা একজন অজ্ঞানীর কাছে বাধা বিপত্তিময় এবং সমস্যা সঙ্কুল, একজন আত্মজ্ঞানীর কাছে, স্বর্গ। সৎ-গুণ, সৌন্দর্য এবং নানা মহৎ কুশলতার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, এবং ঐগুলি তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেগুলি তুমি বাহ্যিক জগতের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে দেখতে পাবে না। সেই অন্তঃমূল তত্ত্বকে বুঝতে তোমাকে একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করতে হবে।

তোমার অন্তরে যে বিশালতা যে ব্যাপ্তি আছে, সে বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা নেই। এই দেহকে সামান্য বলে মনে হয় কিন্তু এর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বের রূপ পাবে। বাইরের সূর্যের থেকে এই দেহের সূর্যের প্রভা হাজার গুণ বেশী, কিন্তু উত্তপ্ত হবার পরিবর্তে এটা শান্ত সমাহিত থাকে। সেই অন্তঃজ্যোতির আলোর জন্যই তোমার মুখমণ্ডল দীপ্তিময় এবং চক্ষুর তারা উজ্জ্বলতর হয় যা নাকি তোমার মস্তিষ্কে আধ্যাত্মিকতার বড় কেন্দ্র সহস্রারে থাকে। হৃদয়ই হচ্ছে জ্ঞানের কেন্দ্র যার মধ্যে তুমি সমস্ত বিশ্বকে দেখতে পাবে। বস্তুতঃ তোমার অন্তরে এত বস্তু আছে যে সেই সব বর্ণনা করে আমি গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখতে পারি। বাইরের জগতে যত সব আশ্চর্য বস্তু দেখ অন্তর্জগতে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে আশ্চর্য বস্তু দেখতে পার। যে আনন্দ তুমি খুঁজছো, তোমার অন্তরে অনেক বেশী পরিমাণে পেতে পার।

সারাজীবন তুমি শুধু তোমার চক্ষুকে সুদৃশ্য, কানকে সুমধুর শব্দে, নাককে সুমিষ্ট গন্ধে, তোমার শরীরকে নরম স্পর্শ পেতে এবং জিহ্বাকে নিত্য নতুন আস্বাদন পেতে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছ। সুমধুর সঙ্গীত শুনতে ইচ্ছা করলে তুমি রক-এন্ড-রোল, সিম্ফনী অথবা অপেরার সঙ্গীত শোনো কিন্তু যখন অন্তঃশক্তি জাগ্রত হয় এবং সহস্রারে ওঠে, তখন তুমি এমন এক দিব্য শব্দ শুনতে পাবে এবং সেটা এত সুমিষ্ট যে তুমি বর্ণনা করতে পারবে না। যখন তুমি সেগুলি শুনতে থাকবে তোমার আনন্দ ততোই বৃদ্ধি হতে থাকবে এমনকি তোমার দৈহিক পীড়াগুলিরও আরোগ্য হতে থাকবে। এইভাবে তুমি সুগন্ধ উপভোগ কর। সুমিষ্ট গন্ধ পেতে তুমি তোমার দেহে সুগন্ধি ঢাল, কিন্তু যখন বার্ধক্য আসে তোমার শরীরে দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে। কিন্তু যখন তুমি ধ্যানের গভীরে যাবে, তোমার সমস্ত শরীর সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে থাকবে। সেই সুগন্ধ এত সুমিষ্ট যে যখন তুমি ঘ্রাণ নাও তোমার শরীর শান্ত হতে আরম্ভ করে।

তুমি স্পর্শের আনন্দ চাও। সেই স্পর্শের আনন্দ পেতে তুমি অন্যের দেহের সঙ্গে তোমার দেহ ঘর্ষণ কর এবং আলিঙ্গন কর যতক্ষণ না তোমার স্পর্শের অনুভূতি চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় এবং তুমি আর অন্য কিছু অনুভব করতে পার না কিন্তু যখন অন্তঃশক্তি জাগরণ হয়, এটা তোমার ভিতরে খেলতে থাকবে। তখন তোমার সমস্ত অস্তিত্ব একটা সূক্ষ্ম স্পর্শের আনন্দ অনুভব করবে এবং তুমি একটা অপূর্ব অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করবে।

তুমি একটা সুন্দর আকৃতি দেখতে চাও এবং তোমার নিজের আকৃতিও সুন্দর করতে চাও। তোমার চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তুমি তোমার মুখে পাউডার, ক্রীম প্রভৃতি মাখ। কিন্তু কালক্রমে এইসব রাসায়নিক দ্রব্য তোমার চামড়াকে নষ্ট করে এবং তখন মেকআপ ছাড়া তোমাকে ভূতের মত লাগবে। তুমি চুলের পরিচর্য্যা কর, সুন্দর সুন্দর বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত কর, কিন্তু তোমার পোষাক একদিন নোংরা হবে ও ছিঁড়ে যাবে। এইরূপ বাইরের রূপ ক্ষণস্থায়ী এটা ক্ষণিকের এবং তারপর হারিয়ে যায়। কিন্তু ভিতরের রূপ অপরিবর্তনশীল। এর বৃদ্ধি নেই এবং বিনাশ নেই। যতোই তুমি ধ্যানের গভীরে যাও তোমার ভিতরে যে

অন্তঃশক্তি কাজ করতে থাকে তার থেকে এমন এক সৌন্দর্যের অনুভব করতে আরম্ভ করবে যে সেটাকে গ্রহণ ও বহন করাই শক্ত হয়ে পড়বে। সহস্রারে অপূর্ব দীপ্তির কেন্দ্রের মধ্যে একটা নীল আলোর ছটা যা নীল মুক্ত নামে পরিচিত সেটাই আত্মার আলো তোমার অন্তরে। এটা দেখে মহান সাধকরা ঘোষণা করেছিলেন, ''ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বাস করেন।''

পৃথিবীতে যা কিছু তুমি খোঁজো তা তোমার ভিতরেই আছে। সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দের ছটা অন্তরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়ে কেবলমাত্র পণ্ডিতি বুদ্ধিতে বোঝাই সব নয়। তোমাকে এর গভীরের মধ্যে যেতে হবে। একে খুঁড়ে বের করতে হবে। তখন তুমি দেখবে ঝক্‌মকে উজ্জ্বল চৈতন্য একটা পরম প্রশান্তিতে তোমার মধ্যে অবস্থান করছে। প্রসিদ্ধ সুফী সাধক, মনসুর মস্তানা বলেছেন,''তুমি একটা মন্দির ধ্বংস করতে পার, একটা মসজিদ্ ভাঙতে পার, তুমি একটা কাবা ভাঙতে পার কিন্তু মানুষের অন্তর ভাঙতে পার না কারণ অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন।'' ঈশ্বরের প্রকৃত অবস্থান হচ্ছে হৃদয়ে এটা আনন্দের আশ্রয়, অসীম ভালবাসার বাসস্থান, সেখানে যাও। *...ক্রমশঃ*

—বঙ্গানুবাদ শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৫৪ : 'জ্ঞান' কি? পরমব্রহ্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ কি?

উত্তর : 'জ্ঞান' অর্থে নিশ্চয়াত্মক বোধে জানা বা কোন বিষয়কে প্রকৃত সত্যরূপে সঠিক জানা। গীতায় নিষ্কাম কর্মের অন্তিম পর্য্যায়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, বলা হইয়াছে। যিনি আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়াছেন, তিনি ''সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম''-কে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাঁহার মন বা চিত্ত সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, পাপ-পুণ্য, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাবের উর্ধ্বে অবস্থান করে, যিনি সর্বত্র সমদর্শী সকল ভূতবর্গকে যিনি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন এবং নিজের অস্তিত্বকে যিনি সর্বভূতের মধ্যে অনুভব করিতে সক্ষম, যিনি আত্মজ্যোতির দর্শনে মুগ্ধচিত্ত ও স্থিতপ্রজ্ঞ সেই আত্ম-উপলব্ধির মহিমায় তাঁহার অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া 'জ্ঞান' প্রকাশমান সূর্য্যের মতো সেই পরমপুরুষ বা পরমব্রহ্মকে তাঁহার সত্তার বক্ষে অন্তরাকাশে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে। জ্ঞান ব্রহ্মের সর্বোত্তম পবিত্র প্রকাশ। জ্ঞান বুদ্ধিসত্ত্বের আলোক। যোগমার্গে সমাধি পর্য্যায়ে সত্য-জ্ঞানের উন্মেষ হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মার জ্যোতিই হল 'জ্ঞান'। জ্ঞানমার্গেই যোগীর পরমাগতি লাভ হয়। জ্ঞান-পর্য্যায়ে হয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। জীবন্মুক্ত অবস্থালব্ধ যোগীর নিকট জ্ঞান পরম নির্বিকার সত্যের সন্ধান প্রদান করে। জ্ঞানী যোগীগণ নিবৃত্তি মূলক বেদধর্ম অবলম্বন করেন।

মহাভারত পুরাণে ধৃতরাষ্ট্র সনৎসুজাত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —''যাঁহারা এই ঋক্, সাম, যজু এই তিন বেদকে অবগত আছেন, তিনি যদি অন্যায় পাপ কর্মও করেন, তবে কি সেই পাপ তাঁহার বন্ধন সৃষ্টি করিবে?'' ইহাতে তখন সনৎসুজাত বলিয়াছিলেন —''ঋক্-সাম-যজুর কর্মমার্গ কখনো একজন মায়াবদ্ধ জীবকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারে না। বৈদিক কর্মের পবিত্রতা শুধুমাত্র তাঁহাকে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে মাত্র, যেমন, এই কথা আছে — ঋক্-সাম-যজুর চর্চায় একজন মানুষ ব্রহ্মলোকে (ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে) বিরাজ করেন। অর্থাৎ, যাহা আচরণ করিলে দেবতার পদবী প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই দেবতাদের অবস্থান বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের মধ্যেই। পরন্তু এই মূর্তামূর্ত মায়া জগতের বাহিরে আরও একটি মহত্তম তত্ত্ব আছে, তাহার জন্যেই তপস্যা করিতে হইবে। সেই তপস্যার পুণ্যে সমস্ত পাপরাশি নির্মূল হইলে পরে জ্ঞানোদয় হইবে। সেই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে। জ্ঞানের দ্বারাই একমাত্র সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে লাভ করা যায়, ইহা ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই; অন্যথায় বারংবার শুধু এই মায়িক জগতে আসা-যাওয়া। এখানে ঋষি সনৎসুজাত মোক্ষধর্মের সার বলিয়া দিলেন ব্রহ্মের পর্য্যায় শব্দ 'সত্য'-কে জ্ঞানেরও অপর পর্য্যায় শব্দ হিসাবে উল্লেখ করিয়া ঋষি বলিলেন — সমগ্র বেদের জ্ঞাতা কেহ নাই অর্থাৎ, সমগ্র বেদ কেহ জানেন না। যদি এমন না হইত, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বেদ জানেন এমন কেহ থাকিতেন, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি কেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে যিনি বলেন —'আমি বেদ জানি', তিনি আসলে যেটি জানিতে হইবে সেই 'বেদ্য' বা জ্ঞাতব্য বস্তুটিকেই জানেন না। যিনি সত্যে বা আত্মায় স্থিত আছেন, তিনিই আসলে 'বেদ্য' বা 'জ্ঞাতব্য' বস্তুকে জানেন। এক্ষেত্রেই 'সত্য বা জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' মহাবাক্যের মধ্যে জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া ওঠেন।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পঞ্চকেদারের পথে পথে

(৪)

তুঙ্গনাথ দর্শন শেষে আবার পথে নামি। গন্তব্য রুদ্রনাথ। পথ খুবই দুর্গম, উচ্চতা ১১৭০০ ফুট, এবার উৎরাই পথ। নেমে আসি চোপতাতে। গাড়ি ধরে এসে পৌঁছাই গোপেশ্বরে। গোপেশ্বরে চামোলী জেলার সদর কার্যালয়। রুদ্রনাথ আর গোপেশ্বর এই দুটিই প্রাচীন মন্দির, এই দুই মন্দিরেরই একটি ট্রাস্টি-বোর্ড আছে, তিনজন পূজারী। প্রতি দুই বছর অন্তর এক-একজনের উপর রুদ্রনাথের সেবার দায়িত্ব পড়ে। গোপেশ্বর মন্দিরের পিছনে বৈতরণী নদী। বাঁধানো রাস্তা গিয়ে মিশেছে নদীতে। রাস্তার ডানদিকে স্নানকুণ্ড, কুণ্ডের পাশে শিবমন্দির, একরাত গোপেশ্বরে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ি রুদ্রনাথের পথে। স্থানীয় গাড়িতে এসে পৌঁছাই সাগর গ্রামে। এখান থেকে ট্রেকিং শুরু, ১৭ কিলোমিটার পথ। দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্পষ্ট ঝরনা। তারই পাশ দিয়ে পাহাড় চূড়া পেরিয়ে নীচে নেমে পাহাড় গুম্ফা। এক পাহাড়ী নদী পেরিয়ে চড়াই শুরু, যেমন জঙ্গল তেমন চড়াই। যতই এগিয়ে চলি পথের বন্ধুরতা যেন ততই বাড়তে থাকে। বড় বড় মহীরুহ সূর্যের আলো চুরি করে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ। জানা অজানা নানা পাখির ডাক। গাছের ডালে গিরগিটির পদচারণা চলার গতি মন্থর করে। একটা ছোটো কাঠের সেতু পেরিয়ে যাই, সামনে আরও একটা কাঠের সেতু। এটা অপেক্ষাকৃত বড়। সেতুর নীচ দিয়ে দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। ডানহাতে একটা ছোটো জলপ্রপাত। সেতু পেরিয়ে পথ আরও বন্ধুর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম, আবার চলা। চড়াই পথে পা যেন আর চলতেই চায়না। দেহ অবসন্ন হয়ে আসে। পথের পাশে পাথরে হেলান দিয়ে ড্রাইফ্রুটস্‌ আর বিস্কুট দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারি। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে দাঁড়িয়েই বিশ্রাম নিতে হয়। বসে পড়লে আর চলা যায় না। বিকেল সাড়ে তিনটে, এসে দাঁড়াই ওয়াই (Y) পয়েন্টে। ডানহাতের রাস্তা ডুমক হয়ে গিয়েছে কল্পেশ্বর, সামনে সুবিশাল সবুজ প্রান্তর, দূরে পাহাড়ের মাথায় শুভ্র পতাকা, সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে পথ গিয়েছে। ঘাসে ঢাকা পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গের মুখ দূর থেকে বোঝা যায় না — ওটাই পানার গুহা। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই গুহা মুখে। গুহার ভিতর থেকে ডাক আসে — ''বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভিতরে আয়।'' দেখি এক সুদর্শন সন্ন্যাসী। মহাত্মা সাদর সম্ভাষণে স্বাগত জানান, এগিয়ে দেন গরম চায়ের গেলাস। পাহাড়ী জড়িবুটি দিয়ে তৈরী হাল্কা সবুজ রঙের চা। চা পানের খানিক পর অনুভব করি পথ চলার কষ্ট, ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছে কোন মন্ত্রবলে। আমার মনের ভাব বোধহয় বুঝতে পারেন সন্ন্যাসী। স্মিত হেসে বলেন, ''অবাক হওয়ার কিছু নেই। হিমালয়ের গাছ-গাছালির ভেষজগুণ এমনই।'' আয়তনে বেশ বড়ই গুহা — একসঙ্গে সাত-আটজন সহজেই রাত কাটাতে পারেন। মহাত্মার সান্নিধ্যে একরাত কাটিয়ে ফের পথে নামা। পানারের পর থেকে চড়াই-এর তীব্রতা বাড়ে। একটার পর একটা পাহাড়ের বুক চিরে পথ গিয়ে উঠেছে পাহাড়ের মাথায় যেখানে শুভ্র শিখর আর নীল আকাশের মিলন ঘটেছে। ডানহাতে অনেকটা নীচে একটা ছোট্ট জলাশয় - তলিতাল। বাঁহাতে সামান্য উপরে আর একটা সরুপথ - অনুসূয়া হয়ে রুদ্রনাথ। দূর থেকে কয়েকটি শুভ্র পতাকা দৃষ্টিগোচর হয়। চড়াই ভেঙে পৌঁছতে হয় নিশানের পদপ্রান্তে। ১৩৬০০ ফুট। এপথের সর্বোচ্চ পাহাড় 'পিতৃধার'। একটির পর একটি পাথর সাজিয়ে মন্দিরের বিকল্প। প্রতিটির মাথায় শুভ্র পতাকা। পিতৃধার থেকে রুদ্রনাথ চার কিলোমিটার, লম্বা ঘাসে ঢাকা সমতল পথ। পাহাড়ের বাঁক ঘুরেই দূরে গুহা মন্দির। ছোট পাহাড়ী ঝোরা পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ, বাঁ পাশে প্রস্তর নির্মিত নারদ মূর্তি। তার নীচেই সানবাঁধানো জলাধার। এটি নারদ কুণ্ড নামে পরিচিত। জলাধার পেরিয়ে যাত্রী নিবাস। পাশেই বনদেবীর মন্দির। মন্দিরের পিছনের গায়ে শিবলিঙ্গ ও ঝরনা। ওই ঝারনার জলেই রুদ্রনাথের স্নান ও পুজো হয়। আরও কয়েক পা এগিয়ে পাথরে বাঁধানো উঠোন, তার শেষ প্রান্তে দেবতার গুহামন্দির, শেষ বিকেলের নরম আলো এসে পড়েছে গুহা মন্দিরের গায়ে। পশ্চিমে দিনান্তের ক্লান্ত রবির বিদায়ের অনাড়ম্বর আয়োজন। চারপাশে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান

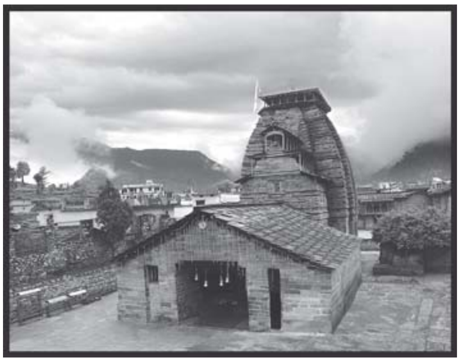

গোপীনাথ মন্দির, গোপেশ্বর

অসংখ্য পর্বতমালা প্রত্যেকের শুভ্র শিখরে গৈরিক উষ্ণীষ। হিমালয়ের জ্যোতির্ময় রূপ, ব্রহ্মময় সত্তা, চৈতন্যময় প্রকাশে বাক্‌রহিত হয়ে যায়। নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি, নীলকণ্ঠ হাতছানি দেয়। পশ্চিমে চৌখাম্বা চোখের ইশারায় তাকে না ভোলার আকুতি জানায়। পূজারীর মুখে শুনি রুদ্রনাথের কাহিনী — কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুদের নিধনে পাণ্ডবগণ পাপাসক্ত হন। পাপ থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা মহাদেবের দর্শনে যান। দর্শনদানে অনিচ্ছুক মহাদেব হিমালয়ের দুর্গম স্থানে আত্মগোপন করেন। মহাদেবের দর্শন না পেয়ে বিষন্ন চিত্তে পাণ্ডবেরা হিমালয়ের নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। দৈবক্রমে মহর্ষি নারদের সাথে তাঁদের দেখা হয়। মহাদেবের অবস্থানের কথা নারদ জানতেন। পাণ্ডবদের মনের অবস্থা তিনি অনুধাবন করে ওই দুর্গম স্থানে তিনি পাণ্ডবদের নিয়ে যান। রুদ্রনাথের মন্দিরের থেকে কিছুটা আগে তিনি পাণ্ডবদের কিছু পরামর্শ দেন। মহাযোগী মহাদেব সেই আলোচনার বিষয়বস্তু জানতে পেরে ঘাড় কাত করে তাদের লক্ষ্য করেন। মহাদেবের দৃষ্টিতে নারদ সেই মুহূর্তে প্রস্তরে রূপান্তরিত হন। ওই স্থানে একটি জলাশয়েরও সৃষ্টি হয়। এটিই নারদকুণ্ড। মহাদেব নিজেও প্রস্তররূপ ধারণ করেন। স্থানীয় বিশ্বাস নারদকুণ্ডের পবিত্র জলের স্পর্শে বা কুণ্ডে স্নান করলে সকল পাপের অবসান ঘটে।

রুদ্রনাথ গুহা মন্দিরের সুপ্রশস্থ অসমান মেঝে, বিশাল আয়তন, মাথা থেকে সামান্য উপরে ছাদ। গর্ভমন্দিরে রুদ্রমূর্তি, কয়েকটি শিবলিঙ্গ, প্রস্তর নির্মিত রুদ্রমূর্তি স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত, প্রকৃতির নিজের হাতে সৃষ্ট, মহাযোগী মহেশ্বরের সাধনপীঠ।

রাতের রুদ্রনাথ — জ্যোস্নাপ্লাবিত বসুন্ধরা, হীরকখচিত গিরিশিখর, নির্মল আকাশের নীচে শুভ্রবসন পরিহিত প্রকৃতির বুকে চন্দ্রমার প্রতিফলন দেখে অবাক হই। রুদ্রনাথে না এলে হিমালয়দর্শন সম্পূর্ণ হয় না।

দিনের আলো ফোটে। পূজারী ঘন্টা বাজিয়ে মন্দিরের দরজা খোলেন। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে দেবতার ঘুম ভাঙে। প্রভাতী অর্চনার প্রারম্ভে দেবতার রাজবেশ হয়। অনাড়ম্বর আয়োজন। রুদ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। পানারে এসে মহাত্মার হাতে 'মাখন' প্রসাদ খেয়ে যাত্রা শুরু। গন্তব্য পঞ্চকেদারের শেষ ধাপ - কল্পেশ্বর।

শান্ত সমাহিত নির্জন কন্দরে কল্পগঙ্গার তীরে মহাযোগী মহেশ্বরের সাধনপীঠ। মহাদেবের জটা প্রকাশিত পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর গুহামন্দিরের অবস্থান সাড়ে সাত হাজার ফুট। হেলাং থেকে ৯ কিলোমিটার ট্রেক। পথ ভালোই। সামান্য চড়াই উৎরাই। পঞ্চম কেদার পরিক্রমায় কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ ও রুদ্রনাথ হয়ে গোপেশ্বরে বিশ্রাম, সেখান থেকে ভোরের প্রথম বাসে চামোলী, পিপুলকোঠি হয়ে হেলাং, সেখান থেকে পায়ে চলা পথের শুরু। পিচরাস্তা ধরে কিছুটা উজান হেঁটে ডানহাতে উৎরাই পথে অলকানন্দা। অলকানন্দার বুকে লোহার ঝোলাপুল, সেতুর শেষপ্রান্তে এসে অলকানন্দাকে বিদায়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ, ডান হাতে অনেক নীচে অলকানন্দা, তার উন্নত ঢেউ তোলা ফেনিল জলরাশি দৃষ্টিগোচর হলেও গর্জন শ্রুতিগোচর হয় না। সামান্য এগিয়ে কল্পগঙ্গা এসে মিশেছে অলকানন্দার সঙ্গে। এখন কল্পগঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে পথচলা। পাহাড়ের কোলে কোলে পথ। মাঝে মাঝে ঝুলন্ত পাহাড় আচ্ছাদন সৃষ্টি করে। হেলাং থেকে চার কিলোমিটার গিয়ে সালনা গ্রাম। সালনা গ্রাম ছাড়িয়ে কয়েক-পা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে পি.ডব্লু.ডি-র বোর্ড -'উর্গম ২০২০ মিটার' উর্গম পেরিয়ে দেবগ্রাম। সবুজের বুক চিরে পথ। দূরে দূরে দুই একটি কাঠের বাড়ি। সামনে গিরিরাজের আঙিনা। দেবতার নাম অনুসারে নাম দেবদেখনি। সামনে সুউচ্চ পর্বতমালা। ডানদিকের কোণে পাহাড়ের মাথায় জলপ্রপাত, বাঁ হাতে পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ডুমকের রাস্তা। পায়ের নীচে সবুজ কার্পেট। দৃষ্টির আড়ালে কল্পগঙ্গার মৃদু গুঞ্জন। পড়ন্ত রবি-রশ্মির স্নিগ্ধ পরশ। পূর্বাকাশে মাখনের টিপ পরা কুমারী চন্দ্রমা। কল্পগঙ্গার বুকে দোদুল্যমান লোহার ঝোলা পুল। পরপারে পাহাড়ের মাথায় সাদা নিশান। মন্দিরের তোরণ দেখা যায়। সেতুর নীচে বেগবতী গঙ্গা। পঞ্চকেদার পরিক্রমার সার্থক রূপায়ণ। হঠাৎই একটা বিশেষ শব্দ। চমকে সামনে তাকাই। কল্পেশ্বর সেতু যেখানে শেষ ঠিক সেইখানে বিশাল এক সাপ। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি না। কি দেখছি সামনে! এই তো সেই শ্বেত-শঙ্খচূড়। এরই সন্ধানে ঘুরেছি কত! কেদারনাথের পথে, হেমকুণ্ডের রাস্তায় ব্রহ্মকমলের বনে। শেষ পর্যন্ত তার দেখা মিলল কল্পেশ্বরে এসে। সকল বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপরে অধ্যাত্ম চেতনার দীপ শিখায় আমি শিহরিত। এযেন প্রেমময় ভগবানের স্বাগত জানানোর নিদর্শন। সর্প রূপে তিনি দর্শন দেন। মুহূর্তে সৌম্যরূপ ধারণ করেন। ফণা নামিয়ে নেমে যান ঝোলা পুলের নীচে। ছোট্ট পতাকা শোভিত তোরণ পেরিয়ে দেবতার আঙিনা, ডানহাতে নাগেশ্বর মহাদেব, বামহাতে বিশ্রামগৃহ, সামান্য এগিয়ে গুহামন্দির। কল্পেশ্বরের নির্মল প্রাকৃতিক

পরিবেশের তুলনা নেই। প্রকৃতির নিভৃত আঙিনায় পাহাড়ের পাদমূলে অপরিসর গুহায় গিরিরাজের শুদ্ধ আসন। বিগ্রহ জটাজুট শিলামূর্তি।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙে। পঞ্চকেদার পরিক্রমার বিষাদময় লগ্ন বড়ই বেদনাময়। ফেরার পথে পা বাড়াই।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

—সমাপ্ত—

আশ্রম সংবাদ

২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর — আশ্রমের ২৮তম নবরাত্রি ব্যাপী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চমীর দিন সকালে শ্রীশ্রীমা প্রায় পাঁচশআশিরও অধিক গ্রামবাসীকে বস্ত্রবিতরণ করেন। সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীদের দ্বারা এক মনোগ্রাহী নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয় এইদিন সন্ধ্যায়। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ। তারপর নৃত্য প্রদর্শন করেন শিশু শিল্পীরা। মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীবাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। নবমী তিথিতে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ বিরতণ করা হয়। পূজার বিভিন্ন দিনে আশ্রমে আসেন রামকৃষ্ণমিশন থেকে স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী ভেদাতীতানন্দজী, ভারতসেবাশ্রম থেকে স্বামী একাত্মানন্দজী এবং পরমহংস যোগানন্দের ধারায় স্বামী চেতনানন্দজী।

১লা অক্টোবর - ১৯শে অক্টোবর — পুষ্করের শ্রীশ্রীটাটবাবা অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে অতিবাহিত করেন।

১৩ই অক্টোবর — শ্রীশ্রীকোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীযজ্ঞনারায়ণ-দার পৌরহিত্যে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর আরাধনা ও যজ্ঞ।

২০শে অক্টোবর — এইদিন সকালে শ্রীশ্রীমা বস্ত্রাদি বিতরণ করেন অগণিত দুঃস্থ ও দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে।

২৭শে অক্টোবর — অমানিশার মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমা নিজে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দেবী তারাকালিকার পূজা করেন।

৫ই নভেম্বর — এইদিন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগ নিবেদিত হয়।

১০ই নভেম্বর — অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়।

১২ই নভেম্বর — রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ হয় দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় অপূর্ব ভজন পরিবেশন করেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা।

১৪-১৫ই নভেম্বর — শ্রীশ্রীমা কিছু ভক্তসহ রাজস্থানের রামদেওরায় শ্রীশ্রীরামদেওরা বাবার মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন।

১লা ডিসেম্বর — এইদিন শ্রীশ্রীমা শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেন বহু দুস্থ গ্রামবাসীর মধ্যে।

৪ঠা - ৫ই ডিসেম্বর — ৪ঠা ডিসেম্বর অষ্টমী তিথির প্রভাতে ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে

পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে শিশুদের প্রসাদ পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় এক সুন্দর ভক্তিগীতির অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী লাবণী লাহিড়ী। ৫ই ডিসেম্বর সকালে লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউদেবের পূজার্চ্চনা ও প্রসাদ বিতরিত হয়।

৮-১৮ই ডিসেম্বর — এইকয়দিন শ্রীশ্রীমা বারাণসী আশ্রম পরিদর্শনে যান। এই সময়ে শ্রীশ্রীমা অন্যান্য মহাত্মাদের আশ্রমেও গিয়েছিলেন - গাজীপুরে পাওহারী বাবার আশ্রমে ও দেওরাহা বাবার আশ্রমে শ্রীশ্রীহংসবাবা ও শ্রীনারায়ণদাস বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফেরবার পথে বুদ্ধগয়াতে যান।

২৫শে ডিসেম্বর — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ৩৩ তম পর্বে প্রশ্নোপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

২৯শে ডিসেম্বর — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন।

৩০শে ডিসেম্বর-২রা জানুয়ারী — এইকয়দিন শ্রীশ্রীমা কিছু ভক্ত সঙ্গে দেওঘর তীর্থ পরিভ্রমণে যান।

৫ই জানুয়ারী — হোটর আশ্রমের শিক্ষার্থীরা এইদিন সন্ধ্যায় একটি মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

भगवान परशुराम

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गर्ग संहिता में भगवान विष्णु के छः अवतार कल्पित हुए हैं; उनमें से प्रथम मरीचि प्रभृति ऋषिगण वे हैं भगवान के अंशांशावतार, ब्रह्मादि देवगण अंशावतार; कपिल, कूर्म्म आदि कलावतार एवं परशुराम आवेशावतार। नृसिंह, दाशरथि राम, नरनारायण ये हैं पूर्णावतार और श्रीकृष्ण स्वयं परिपूर्णतमावतार। अवतार जैसे भी क्यों न हो समस्त अवतारों के मध्य ही श्रीभगवान की पूर्ण शक्ति का परिपूर्ण प्रकाश रहता है। योगमार्ग में भगवत्-स्वरूप के पथ पर ब्रह्मर्षि महर्षि ऋषि भगवत् निर्देश द्वारा अवतार ग्रहण कर धरातल पर अवतीर्ण हुए हैं, आत्मज्ञानी सत्यद्रष्टा महात्मा इनसे अवश्य ही अवगत रहते हैं। भगवान परशुराम इन समस्त अवतारों के मध्य एक विशेष अवतार चरित्र थे।

भगवान परशुराम

राजा कुशनाभ के पुत्र कुशिक एवं कुशिक के तपोलब्ध देवराज इन्द्रांश से जन्म लेने वाले पुत्र गाधि की सत्यवती नाम की एक रूपवती कन्या थी। महर्षि भृगु का अन्यतम पुत्र था ऋचीक। ऋचीक द्वारा सत्यवती से विवाह करने की अभिलाषा करने पर गाधि ने कहा –''तपोधन! मेरे पूर्वज परम्परा में एक नियम प्रचलित रहा है कि हमलोग कन्यादान के समय में अभ्यंतर रक्त, बहिःश्यामवर्णयुक्त पाण्डु कलेवर चन्द्र के सदृश ज्योति विशिष्ट तथा एक ओर का कर्ण श्यामवर्ण एवं वेगवान सहस्र अश्व शुल्क-स्वरूप ग्रहण करते है। किन्तु मैं आपसे शुल्क नहीं ले सकता अथच आपके सदृश व्यक्ति को कन्यादान करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है।'' ऋचीक ने गाधि की बात श्रवण कर जलाधिपति वरुणदेव से उपरोक्त प्रकार के अश्वादि प्राप्त कर उनके विनिमय में सत्यवती से विवाह किया। एकबार महातेजस्वी ऋषि भृगु तनय ऋचीक के आश्रम में उपस्थित हुए इस पर पुत्र और पुत्रवधू उभय ने ही उनकी पादवन्दना की। इसलिए भृगु ने अतिशय खुश होकर सत्यवती से वर प्रार्थना करने के लिए कहा। सत्यवती ने अपने लिए एवं निज जननी के लिए पुत्र की प्रार्थना की। भृगु ने तब दो प्रकार के चरु प्रदान कर कहा –''तुम उडुम्बर और तुम्हारी जननी अश्वत्थ वृक्ष को आलिंगन कर चरुद्वय भक्षण करना।'' परन्तु सत्यवती और उनकी माता ने वृक्षालिंगन और चरुभक्षण के लिए सम्पूर्ण विपरीत आचरण किया। महर्षि भृगु ने योगबल से जानते हुए कहा –''चूँकि तुमलोगों ने चरुभक्षण और वृक्षालिंगन में सम्पूर्ण विपरीत आचरण किया है, उस कारण से तुम्हारे गर्भ में क्षत्रिय वृत्तिधारी एक ब्राह्मण एवं तुम्हारी माता के गर्भ से ब्राह्मणाचार सम्पन्न एक पुत्र जन्म लेगा।'' यह बात सुनकर तब सत्यवती ने विनयपूर्वक कहा – ''भगवन! मुझे ऐसा पुत्र ना हो। बल्कि ऐसे लक्षण सम्पन्न पौत्र के जन्म लेने से कोई क्षति नहीं होगी।'' तब भृगु ने 'तथास्तु' कहकर प्रस्थान किया। यथासमय सत्यवती ने जमदग्नि का प्रसव किया। जमदग्नि ने वेदादि का अध्ययन कर अनेकानेक ऋषियों को उस क्षेत्र में पराजित किया। इक्ष्वाकु वंशीय राजा प्रसेनजित् की कन्या रेणुका को प्रार्थना करने पर राजा प्रसेनजित् ने यथासमय शुभलग्न में जमदग्नि के साथ रेणुका का विवाह सम्पन्न करवाया। इसके बाद रेणुका से रुमन्वान, सुषेन, वसु, विश्वावसु और परशुराम ने जन्मग्रहण किया।

'परशु' हुए धर्मयज्ञ के अस्त्र कुठार; 'राम' हुए आत्मा-नारायण। आत्मयज्ञ ही प्रकृत धर्मयज्ञ एवं उसी यज्ञ की यज्ञाग्नि सत्ता के समस्त कलुष नाश कर देती है। कुठार द्वारा यज्ञकाष्ठ संग्रह होती है, इसीलिए कुठार अति पवित्र अस्त्र है। आत्मचैतन्य की चिदग्नि ही है ज्ञानाग्नि, जिसके द्वारा सनातन सत्य उद्भाषित होता है। इसीलिए परशुराम हैं ज्ञानाग्नि स्वरूप धर्मास्त्र विशेष। भागवत के मतानुसार भगवान परशुराम श्रीनारायण के षोड़श अवतार है। आत्मज्ञान की महिमा से भगवान परशुराम हुए, भगवान सनत्कुमार के 'जगन्नाथ' पद पर अधिष्ठित रूप के 'बलराम' शक्ति रूपी,

ऋषित्व के भगवत्ता के प्रकाश रूप। इसीलिए वे हैं आवेशावतार।

किसी एक समय महर्षि जमदग्नि के पुत्रगण फलादि आहरण करने के लिए वन में गये एवं उनकी पत्नी रेणुका उसी समय नदी में स्नान करने गयी। स्नान करके नदी के तट से लौटते समय माता रेणुका ने नदी में मार्तिकावत देश के राजा चित्ररथ को अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ारत देखा। परम सुन्दर राजा चित्ररथ को देखकर रेणुका मुग्ध हो गयी एवं राजा के प्रति आसक्त हो गयी। राजा के संबंध में चिन्ता करते–करते ही रेणुका आश्रम में लौटी। किन्तु महर्षि जमदग्नि ने उसके मनोभावों को भाँप लिया एवं अतीव क्रुद्ध होकर उनकी भर्त्सना करने लगे। उसी समय चारों पुत्रों के आश्रम में लौटने के पश्चात् जमदग्नि पुत्रों को मातृवध के लिए प्रेरित करने लगे। लेकिन माता के प्रति स्नेहवशत: जमदग्नि के चारों पुत्रों ने माता का वध करना अस्वीकार कर दिया। पुत्रों द्वारा उनका आदेश पालन करने में असमर्थ होने पर महर्षि ने उन्हें अभिशाप दे दिया। उसके बाद कनिष्ठ पुत्र राम के आश्रम में आने पर जमदग्नि ने अन्यान्य पुत्रों की तरह राम को भी सम्पूर्ण घटना से अवगत करवाया एवं माता का वध करने का आदेश दिया। पिता के आदेश को शिरोधार्य कर परशुराम ने कुठार के आघात से माता का शिरोच्छेद कर दिया। तब जाकर जमदग्नि का उग्र क्रोध प्रशमित हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर तब राम से कहा –''तुमने मेरे आदेश का पालन करते हुए अति दुष्कर कर्म किया है। अतएव तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने वर के लिए प्रार्थना करो।'' परशुराम ने तब सद्‌गुरु पिता से माता का पुनराय जीवनलाभ, मातृहत्या की घटना का विस्मृत होना, मातृहत्या के पाप से मुक्ति, भ्राताओं की शाप से मुक्ति, युद्ध में अपनी अप्रतिद्वंदीता एवं दीर्घायु – इन समस्त वरों के लिए प्रार्थना की। महर्षि जमदग्नि ने तब प्रसन्न चित्त से इन सभी वरों को परशुराम को प्रदान किया। अवतार स्वरूप व्यक्तित्वों में विचित्र वैशिष्ट्य परिलक्षित होते हैं। जन्मान्तर की तपस्या के दिव्यबल परशुराम की व्यक्तिसत्ता में ग्रथित होने के कारण वे मायामुक्त अवस्था में जन्मग्रहण करते हैं एवं एक ओर पिता एवं 'सद्‌गुरु'-पिता के प्रति सहजात 'अटल विश्वास' रहने के कारण उनको पिता के आदेश को शिरोधार्य करने में कोई द्विधाबोध या संशय नहीं था। सद्‌गुरु के कर्म का विचार नहीं करना चाहिए। जो विश्वास पर उपनीत हैं वे ही सद्‌गुरु से नित्ययुक्त हैं। सद्‌गुरु की प्रसन्नता से असाध्य साधन भी सम्भव हो जाते हैं। इसीलिए हमलोग देखते हैं कि परवर्तीकाल में माता रेणुका पुन: शुद्धचित्त को प्राप्त हुई एवं परशुराम के भ्राताओं ने भी पुनर्जीवन प्राप्त कर अपना परवर्ती योगजीवन सार्थक किया।

इसके बाद मातृवधरूपी पाप के मोचन के लिए पितृ–उपदेश से परशुराम उत्तर में कैलाश और दक्षिण में गंधमादन पर्वत के मध्यवर्ती स्थल में ब्रह्मपुत्र नामक महाकुण्ड में स्नान और तपस्या करने गये। वहाँ स्नान और जल पान कर परशुराम ने लोक हिताभिलाषा से अपने परशु की सहायता से उपयुक्त पथ निर्माण कर क्षण में ब्रह्मपुत्र को पृथ्वी पर समतल में अवतरित किया।

इसके पश्चात् एक बार हैहय देश के अधिपति कार्तवीर्यार्जुन मृगयार्थ वन में भ्रमण करते–करते जमदग्नि के आश्रम में उपस्थित हुए। महर्षि ने अपनी कामधेनु की सहायता से राजा और राजन्यवर्ग का यथायथ सत्कार किया, कामधेनु की आश्चर्यजनक क्षमता देखकर राजा ने प्रलोभित होकर होमधेनु (कामधेनु कपिला) का हरण और वृक्षछेदन द्वारा आश्रम को श्रीहीन कर जमदग्नि के ऊपर अत्याचार कर वत्ससह गाय को अपनी राजधानी माहीष्मती पुरी में ले गये। जमदग्नि के कनिष्ठ पुत्र परशुराम आश्रम में आकर पिता के मुख से राजा के दुराचार की घटना का श्रवण कर तथा आश्रम की श्रीहीन अवस्था देखकर अतिशय क्रुद्ध हुए एवं युद्ध में कार्तवीर्य को परास्त और निहत किया। तदनन्तर कार्तवीर्य के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति के समय एकदिन आश्रम में प्रवेश कर परशुराम के पिता जमदग्नि को एकाकी पाकर निरस्त्र तपस्वी को प्रहार से जर्जरित कर उनका संहार कर दिया। परशुराम के आश्रम में लौटने पर पिता को मृत देखकर और समस्त वृत्तान्त श्रवण करने के पश्चात् पिता की अन्त्येष्टि समापनान्त माहीष्मती के रणस्थल में कार्तवीर्य के पुत्रों का संहार–साधन किया। तत्पश्चात् उनके अनुगत क्षत्रियों का एक–एक करके विनाश करने लगे। इस प्रकार परशुराम ने पृथ्वी को एक–विंशति (इक्कीस) बार क्षत्रियहीन कर समस्त पंच तीर्थों में रुधिरमय पंच–तीर्थ निर्माण कर पितृलोक का तर्पण किया। परिशेष में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर समग्र पृथ्वी महर्षि कश्यप को दक्षिणा स्वरूप प्रदान की एवं कश्यप के निर्देश से वे पश्चिम समुद्र उपकुल में वास करने लगे। इस क्षेत्र में भगवान परशुराम का अन्याय के प्रतिवाद स्वरूप दुष्टों

का दमन और शिष्टों का पालनकर्त्ता का रूप सुस्पष्ट हो गया। भृगुवंशी ऋषिगण प्रायः सभी अस्त्रविद्या विशारद थे। रामायण में उल्लिखित है, भगवान परशुराम ने श्रीहरि का कवचधारण कर जिस वैष्णव धनुष से इक्कीस बार क्षत्रिय निधन किया था, वह धनुष उन्हें पिता जमदग्नि से प्राप्त हुआ था। पिता जमदग्नि के सदृश परशुराम भी धनुर्विद्या में उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। परशुराम श्रीभगवान नारायण के षोड़श अवतार थे, यही है भागवत के मतानुसार। श्री भगवान के अन्यतम स्वरूप कवि जयदेव ने लिखा है – ''क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं। केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे।।''

अर्थात् हे परशुराम रूपधारी! एक दिन तुमने क्षत्रियरुधिररूपी जल से जगत् को स्नान करवाकर इसे निष्पाप और तापशून्य किया था। हे केशव! हे हरे! तुम जय युक्त होओ।। – (इति जयदेवकृत 'दशावतार स्तोत्रम्')

पृथ्वी को क्षत्रियविहीन करने के पश्चात् भगवान परशुराम ने अपने शिवगुरु शिव और शिवा एवं गुणों में नारायण तुल्य उन गुरुपुत्र कार्तिक और गणेश का दर्शन करने की अभिलाषा से कैलास गमन किया। उस समय पार्वतीपुत्र गणेश द्वार-रक्षा के कार्य में नियुक्त थे। महादेव निद्रित अवस्था में थे अतएव उन्होंने परशुराम का भीतर प्रवेश निषेध किया। इससे अतिक्रुद्ध होकर परशुराम ने शिवदत्त परशु द्वारा गणेश पर प्रहार किया इससे गणेश का एक दन्त भग्न हो गया। भगवान परशुराम और श्रीकृष्णरूपी गणेश का युद्ध और दंतभंग एक ईश्वरीय लीला थी। इस लीला के मध्य परब्रह्म स्वरूप गणेश का 'एकदन्त' नामरूप सार्थक हुआ। 'एक' शब्द का अर्थ प्रधान एवं 'दन्त' शब्द का अर्थ बल, अतएव सर्वापेक्षा प्रधान योगसिद्धि बल सम्पन्न जो हैं उन्हें ही 'एकदन्त' की उपाधि प्रदान की गई। श्रीगणेश ने युद्धकाल में परशुराम को अपने पिता महादेव का अतिप्रिय शिष्य जानकर उन पर प्रहार नहीं किया स्तम्भन पूर्वक समग्र ब्रह्माण्ड यहाँ तक कि नित्यधाम गोलोक बैकुण्ठादिलोक का भी दर्शन करवाया एवं परशुराम को सनातन सगुणब्रह्म देही श्रीकृष्ण भगवान का भी दर्शन करवाया। अतएव परशुराम के समस्त कर्मफल विनष्ट हो जाते हैं। महादेव प्रदत्त परशु अस्त्र ही परशुराम का महा महाबल स्वरूप था। गणेश और परशुराम की लीला के माध्यम से गणेश के यथार्थ आत्मपरिचय एवं परशुराम के प्रकृत आत्मपरिचय से अवगत होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस कहानी का विस्तारित व्याख्यान हैं।

त्रेतायुग में सीता के स्वयम्वर सभा में भगवान श्रीराम द्वारा परशुराम के शिवधनुष को भंग करने की वार्ता श्रवण कर परशुराम ने वहाँ आगमन किया एवं वे श्रीराम के साथ द्वन्द्वयुद्ध करने के लिए अग्रसर हुए एवं स्वीय करस्थित धनुष प्रदान कर उसमें गुण आकर्षण करने के लिए श्रीराम का आह्वान किया। श्रीराम ने उस नवगुण सम्पन्न धनुष को शर-संधान कर कहा, ''इस समय शर कहाँ निक्षेप करूँगा?'' अवशेष में परशुराम की तपोलब्ध समस्त शक्ति हरण कर समस्त लोकगत संचित शक्ति नष्ट कर उन्होंने शर सन्धान किया। इस पर परशुराम का विशुद्ध अहंकार चूर्ण हो गया एवं तब उन्होंने अपने क्रोध का संवरण कर ज्ञानचक्षु द्वारा श्रीराम के आत्मस्वरूप का दर्शन कर विनयपूर्वक स्तव किया। तत्पश्चात् उन्होंने पुनः तपस्यार्थ हिमालय पर्वत पर गमन किया। भगवान शंकर के वर से परशुराम ने अमरत्व प्राप्त किया था।

महाभारत में भगवान परशुराम का प्रकाश परमब्रह्मस्वरूप परमगुरु रूप में था। वे कुरु-पाण्डव के अस्त्रगुरु द्रोणाचार्य के अस्त्रगुरु थे। सर्वस्व दान के इच्छुक परशुराम के निकट से द्रोण ने अस्त्रशस्त्र और उनके प्रयोग कौशल को दान स्वरूप प्राप्त किया था।

परवर्तीकाल में देखा गया कि भगवान कल्कि ने परशुराम से वेदादि अध्ययन किया था। अध्ययनोपरांत कल्कि के गुरुदक्षिणा प्रदान करने की इच्छा जाहिर करने पर परशुराम ने कहा – ''तुम सिंहल द्वीप जाकर विष्णुप्रिया पद्मा का पाणिग्रहण कर सनातन धर्म की संस्थापना करोगे। तुम दिग्विजयी होकर धर्मवर्जित कलिप्रिय भूपालगण को परास्त कर अनाचारी बौद्धधर्मावलम्बियों का संहार करोगे। तत्पश्चात् देवापि और मरु (इक्ष्वाकु वंशीय शीघ्र-तनय मरु) नाम के धर्मपरायण उभय को राज्य में प्रतिष्ठित करोगे।'' अर्थात्, धर्मराज्य संस्थापन करने के लिए परशुराम ने निर्देश दिए।

हिमालय के गहन में ज्ञानगंज में आज भी विराजित हैं जन्मरहित अवतार पुरुष भगवान परशुराम। ज्ञानगंज के महान आचार्य पद पर वे 'भृगुराम स्वामी' नाम से अभिहित है। योगाचार्य भृगुराम-स्वामी श्रीविशुद्धानन्द परमहंसदेव के योगीश्वर गुरुदेव थे। उन्हें हमलोग सश्रद्धा कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

पंचकेदार के पथ पर

(४)

तुंगनाथ का दर्शन कर फिर पथ पर चलने लगा। गंतव्य था रुद्रनाथ; पथ अति दुर्गम। ऊँचाई ११७०० फीट, अब अवरोहण पथ है। आ पहुँचा चोपता में, गाड़ी पकड़कर गोपेश्वर आया। गोपेश्वर में चामोली जिला का सदर-कार्यालय है। रुद्रनाथ और गोपेश्वर यही दो प्राचीन मंदिर है, इन दोनों मंदिरों की एक न्यास-समिति है। तीन पुजारी नियुक्त है। प्रति दो वर्ष के अंतराल पर एक-एक व्यक्ति को रुद्रनाथ की सेवा का दायित्व दिया जाता है। गोपेश्वर मंदिर के पीछे वैतरणी नदी है। पक्का रास्ता जाकर मिलता है नदी से। पथ के दाँयी तरफ स्नान कुंड है, कुंड के पास ही शिवमंदिर है। एक रात गोपेश्वर में बिताकर रुद्रनाथ चले आए। स्थानीय गाड़ी द्वारा आ गया सागर ग्राम। यहाँ से पहाड़ी पथ प्रारंभ हुआ, पथ की लंबाई १७ कि.मी। दूर पर्वतशिखर पर एक अस्पष्ट झरना दर्शित हुआ। उसके किनारे से होकर पर्वतश्रृंग पार कर नीचे उतरने पर है एक पर्वतगुहा। एक पहाड़ी नदी पारकर फिर चढ़ाई आरंभ हो गयी। उस पथ में जैसा घना जंगल, उतनी ही अधिक चढ़ाई। जितना ही आगे बढ़ता गया, पथ की विषमता भी बढ़ती गयी। ऊँचे-ऊँचे वृक्ष मानों सूर्यालोक को चुरा कर ले जा रहे हैं। बीच-बीच में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। परिचित-अपरिचित अनेक पखेरुओं का कलरव। वृक्ष की शाखाओं पर गिरगिट के आवागमन से चलने की गति घीमी हो जाती है। एक लघु काष्ठ-सेतु को पार किया तथा आगे एक और लकड़ी का पुल दिखा; जो उसकी तुलना में बड़ा है। सेतु के नीचे से प्रबल वेग से प्रवाहमान है पहाड़ी नदी। दाँयी तरफ एक छोटा सा जलप्रपात दिखा। उस पुल को पार करने के पश्चात् पथ अत्यधिक दुर्गम हो गया। बीच-बीच में थोड़ा विश्राम करता, फिर चलता। चढ़ाई पथ पर पैर मानों जवाब दे रहे थे। शरीर भी अब थकान महसूस कर रहा था। पथ के किनारे पत्थर का टेक लेकर थोड़ा सूखा मेवा और बिस्किट खाकर दोपहर का खाना समाप्त किया। पहाड़ी पथ पर चलते समय, खड़े होकर ही विश्राम किया जाता है। बैठजाने पर चलने की इच्छा नहीं होती। अपराह्न साढ़े-तीन बजे आ पहुँचा Y Point पर। दाँयी तरफ का रास्ता डुमक होते हुए गया है कल्पेश्वर, सामने है हरियाली पूर्ण खुली जगह, दूर पर्वत शिखर पर शुभ्र पताका, हरियाली-युक्त खुली जगह के मध्य से होकर ही रास्ता गया है। तृणावृत पहाड़, पर्वत में प्राकृतिक सुरंग, जिसका प्रवेश-द्वार दूर से स्पष्ट दर्शित नहीं है। वही है पानार गुहा। धीरे-धीरे गुहा के प्रवेश-द्वार तक पहुँचा। गुफा के भीतर से आवाज आयी -''बाहर क्यों खड़े हो भीतर आ जाओ।'' एक सुदर्शन सन्यासी को देखा। महात्मा ने सादर सम्भाषण द्वारा स्वागत किया और गर्म चाय का गिलास बढ़ाया मेरी तरफ। पर्वतीय जड़ी-बुटियों से निर्मित हल्के हरित रंग की चाय। चाय पीने के कुछ ही देर में लगा कि न जाने किस मंत्रबल से पथ की क्लान्ति तिरोहित हो गयी। मेरे मन की इस अवस्था को शायद सन्यासी समझ गये। स्मित हँसी के साथ उन्होंने कहा, ''इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हिमालय के पेड़-पौधों की प्रकृति औषधीय ही है।'' गुहा भीतर से बहुत बड़ी थी। एक साथ सात-आठ व्यक्ति रात्रि-विश्राम कर सकते हैं। महात्मा के सान्निध्य में एक रात बिताकर फिर चल पड़ा। पानार के पश्चात् पथ की चढ़ाई की तीव्रता बढ़ने लगी। एक के बाद एक पर्वत के बीच से होते हुए रास्ता जा पहुँचा गिरि-श्रृंग पर जहाँ पर शुभ्र शिखर एवं नीले आकाश का मिलन हुआ। दाँयी तरफ काफी नीचे एक छोटा सा जलाशय - तलीताल। बॉयी तरफ थोड़ा ऊपर जाकर और एक संकरा रास्ता - अनुसूया होते हुए रुद्रनाथ। दूर से बहुत सारी शुभ्र पताकाएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। चढ़ाई के पश्चात् पँहुचा उसी निशान के पदप्रान्त में; ऊँचाई १३६०० फीट। इस रास्ते का सर्वोच्च पर्वत 'पितृधार' है। एक के ऊपर एक पत्थरों को सजाकर मंदिर की प्रतिकृति। प्रत्येक के शिखर पर शुभ्र पताका। पितृधार से रुद्रनाथ ४ कि.मी. लम्बा तृणावृत समतल पथ। पहाड़ का रास्ता घूमकर दूर एक गुहा मंदिर। छोटा पहाड़ी झरने के उस पार है मंदिर प्रांगण, बॉयी तरफ पाषाणनिर्मित नारद की मूर्ति। उसके नीचे सीमेंट निर्मित तडाग। यह नारद कुंड कहलाता है। तालाब के उस पार है यात्री निवास। उसके पास है वनदेवी का मंदिर। मंदिर के पीछे सटा हुआ शिवलिंग एवं झरना है। इस झरना का जल ही रुद्रानाथ के स्नान एवं पूजा हेतु प्रयुक्त होता है। आगे कुछ कदम चलने पर दिखा प्रस्तर निर्मित आँगन,

जिसके अंतिम भाग में है देवता का गुहा मंदिर, सूर्यास्त के समय धीमा प्रकाश गुहा मंदिर पर आपतित होता है। पश्चिम में दिवस के अंत में क्लांत रवि के विश्राम का आडम्बरहीन आयोजन। परितः कतार में खड़ी असंख्य पर्वतमाला सब के शुभ्र शिखर पर गैरिक पगड़ी। हिमालय का ज्योतिर्मय रूप, ब्रह्ममय सत्ता, चैतन्यमय प्रकाश में वाक्रहित हो जाता है। नंदादेवी, त्रिशूल, द्रोणगिरि, नीलकंठ भी हाथ से संकेत कर बुला रहे हैं। पश्चिम में चौखम्बा आँख के इशारे से उसे नहीं भूलने की विनती कर रहा है। पुजारी के मुख से रुद्रनाथ की कहानी सुनी – कुरुक्षेत्र युद्ध में आत्मीयगणों के निधन से पांडवगण पाप के भागी बने। इस पाप से मुक्ति हेतु वे महादेव के दर्शनार्थ चले, परन्तु दर्शन नहीं देने की इच्छा से महादेव ने हिमालय के दुर्गम स्थान में आत्मगोपन किया। महादेव का दर्शन नहीं पाकर विषन्न-चित्त पांडवगणों ने हिमालय में बहुत जगहों पर परिभ्रमण किया। दैववश महर्षि नारद के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। महादेव के अवस्थान की जानकारी नारद को थी। पांडवों के मन की अवस्था को समझकर उन्होंने पांडवों को उस दुर्गम स्थान पर पहुँचाया। रुद्रनाथ के मंदिर से कुछ पहले उन्होंने पांडवों को कुछ सलाह दी। महायोगी महादेव ने उस वार्तालाप की विषय वस्तु जानकर सिर घुमाकर उन्हें देखा। महादेव के दृष्टिपात से नारद उसी क्षण प्रस्तर में रूपान्तरित हो गये। उस स्थान पर एक जलाशय की भी सृष्टि हुई। इसे ही नारद-कुंड कहते हैं। महादेव स्वयं भी पाषाण में परिणत हो गए। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि नारद-कुंड के पवित्र जल के स्पर्श से या कुंड में स्नान करने से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं।

रुद्रनाथ गुहा-मंदिर का सुप्रशस्त फर्श उबड़-खाबड़ है तथा विशाल आयतन तथा इस के छत की ऊँचाई भी सिर से थोड़ी ऊपर। गर्भ मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग प्रस्तर निर्मित तथा रुद्रमूर्ति स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित। प्रकृति के हाथों से सृजित महायोगी महेश्वर का साधन पीठ।

निशाकालीन रुद्रनाथ ज्योत्स्नाप्लावित वसुंधरा, हीरक-सुसज्जित गिरिश्रृंग, निर्मल आकाश के तले शुभ्र वसन परिहित प्रकृति के वक्ष पर चंद्रमा का प्रतिबिम्ब देखकर अवाक् रह गया। रुद्रनाथ नहीं जाने पर हिमालय का दर्शन अधूरा रह जाता।

सुबह पौ फटते ही पुजारी घंटा बजाकर मंदिर का द्वार खोलते है। वैदिक मंत्रोच्चार से देवताओं की नींद टूटी। प्रातः अर्चना के आरंभ में देवताओं को राजवेश पहनाया जाता है। आडम्बरहीन आयोजन। रुद्रनाथ का आशीर्वाद मस्तक पर धारण कर वापसी पथ पर अग्रसर हुआ। पानार पहुँचकर महात्मा के हाथ से माखन प्रसाद ग्रहण कर पुनः यात्रा आरंभ की। गंतव्य था पंचकेदार का अंतिम पड़ाव – कल्पेश्वर।

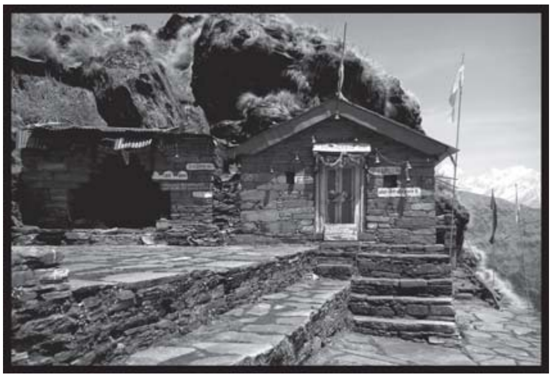

रुद्रनाथ गुहा-मंदिर

शांत समाहित निर्जन कंदर में कल्पगंगा के तट पर महायोगी महेश्वर का साधन पीठ। महादेव की जटा से प्रकट पंचम केदार कल्पेश्वर गुहा मंदिर का अवस्थान ७५०० फीट। हेलां से ९ कि.मी. का पैदल पथ। रास्ता अच्छा है सामान्य उतार-चढ़ाव। पंचम-केदार की परिक्रमा में केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ होते हुए गोपेश्वर में विश्राम, वहाँ से सुबह पहली बस से चामोली, पिपुलकोटि होते हुए हेलां, वहाँ से पैदल पथ आरंभ हुआ। पक्के-रास्ते से कुछ ऊँचाई पर चलने के बाद, दाँयी तरफ अवरोहण पथ पर है अलकानंदा। अलकानंदा के वक्ष पर लौह निर्मित झूलता हुआ पुल। सेतु के अंत में पहुँचकर अलकानंदा से विदा लिया। पहाड़ से एकदम सटा हुआ पथ जिसकी दाँयी तरफ बहुत नीचे प्रवाहित है अलकानंदा, जिसकी ऊँची-ऊँची तरंगयुक्त झागवाली जलराशि दिखाई देने पर भी उसका गर्जन सुनायी नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर पाया कल्पगंगा और अलकानंदा का संगम। इसी कल्पगंगा के किनारे-किनारे पहाड़ के बगल से रास्ता है। बीच-बीच में झूलते हुए पहाड़ द्वारा आवरण की झलक। हेलां से ४ कि.मी. आगे जाने पर आया सालना ग्राम। सालना ग्राम पारकर कुछ कदम आगे बढ़ने पर नज़र आया पी.डब्लू.डी का बोर्ड –'उर्गम २०२० मीटर', उर्गम पारकर अवस्थित है देवग्राम। हरियाली के मध्य से जाता हुआ पथ।

दूर-दूर पर एक दो काष्ठ निर्मित आवास। जिसके सामने है गिरिराज का आँगन। देवता के नामानुसार इस आँगन का नाम है देव-देखनि। इसके ठीक सामने ऊँची-ऊँची पर्वतमालाएँ। दाँयी तरफ कोने पर पर्वत शिखर पर जलप्रपात, बाँयी तरफ पहाड़ से सटा हुआ जंगल के बीच से होता हुआ डुमक का रास्ता। पैर के नीचे हरा गलीचा। नज़रों से ओझल कल्पगंगा का मृदु गुंजन। अस्ताचलगामी सूर्य-रश्मि का स्निग्ध स्पर्श। पूर्व की तरफ अम्बर में माखन का टीका लगाए कुमारी शशी। कल्पगंगा के वक्ष पर झूलता हुआ लौह निर्मित सेतु। दूसरी तरफ पर्वत शिखर पर शुभ्र चिह्न। मंदिर का तोरण दृष्टिगोचर हुआ। पुल के नीचे प्रवाहमान गंगा। पंचकेदार की परिक्रमा का सार्थक रूपायण। अचानक एक विशेष शब्द सुनाई पड़ा। विस्मित होकर सामने देखा कि कल्पेश्वर सेतु जहाँ समाप्त होता है वही पर एक विशाल सर्पराज हैं। सहसा अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह क्या देख रहा हूँ सामने! यह तो वही श्वेत शंखचूड़। इसकी ही खोज में मैं कितना घूमा हूँ केदारनाथ के पथ पर, हेमकुंड के रास्ते पर ब्रह्मकमल वन में। अंत में उससे भेंट हुई कल्पेश्वर आकर। सारे विश्वास-अविश्वास के परे अध्यात्म चेतना की दीपशिखा से मैं सिहरित हूँ। यह मानों प्रेममय भगवान का स्वागत करने का निदर्शन है। अहिरूप में उन्होंने दर्शन दिया। क्षणभर में सौम्यरूप धारण किया उन्होंने। फन गिराकर वे उतर पड़े झूलते पुल के नीचे। छोटा पताका शोभित तोरण पारकर देवता का आँगन, दाँयी तरफ नागेश्वर महादेव एवं बाँयी तरफ विश्राम गृह, सामने कुछ आगे बढ़ने पर गुहा मंदिर। कल्पेश्वर की निर्मल प्राकृतिक सुषमा अतुलनीय है। प्रकृति के शांत आँगन में पर्वत के पादप्रदेश में लघु-गुहा में गिरिराज का शुद्ध आसन। विग्रह है जटाजूट शिलामूर्ति।

दूसरे दिन प्रात: नींद खुलते ही पंचकेदार परिक्रमा का विषादमय लग्न अति वेदनामय। वापसी पथ पर चल पड़ा।

–मातृचरणाश्रित श्री सौरभ बसु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

–समाप्त–

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (७२) : श्रीश्रीबाबा की एक क्रियावान सन्तान श्रीश्रीबाबा (लाहिड़ी बाबा को) 'दादा' कहकर संबोधित करते थे; मैंने 'योगीश्वर दादा की कीर्ति' नाम से संकलित उन क्रियावान भद्रलोक के स्वयं के मुखाश्रित कुछ घटनाओं को यहाँ उद्धृत किया है।

एकबार, सात दिनों से मेरे (क्रियावान के) वक्ष-स्थल में असहनीय वेदना हो रही थी, तब तक मैंने किसी भी डॉक्टर या औषधि की सहायता नहीं ली थी। यन्त्रणा भी प्रत्येक दिन बढ़ती ही जा रही थी। एकदिन बाध्य होकर मैंने अपने छोटे काका के बड़े लड़के को दादा के पास भेजा। मुझे दादा जिस नाम से बुलाते थे वही नाम बताकर उससे कहा कि दादा को मेरी असहनीय वेदना से अवगत करवाना। भाई ने लौटकर मुझे बताया – ''तुम्हारे गुरुदेव को मैंने सब बता दिया है। उन्होंने कहा है – 'ठीक है'।'' दूसरे दिन मैं सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जब दादा के पास गया तो दादा ने नवदा से कहा, ''वह कितना सह सकता है उसकी परीक्षा कर रहा था।''

प्रसंग (७३) : यह घटना दादा के मुख से ही सुनी हुई है – वे (श्रीश्रीबाबा) तब शिवपुर श्मशान में रात्रि में साधना करने जाते थे। तब शीतकाल का समय था, अच्छी ठण्ड गिर रही थी, बीच-बीच में वृष्टि भी हो रही थी, दादा को कम्बल लपेटे हुए देखकर उनकी माँ ने आवाज़ देते हुए कहा –''क्या! आज श्मशान नहीं जाओगे?'' उन्होंने ठण्ड और वृष्टि का बहाना बनाया। इस पर मातारानी ने दादा से कहा –''आज जाने पर

सम्भवतया माँ से साक्षात्कार हो सकता था।'' अतएव मातृआदेश शिरोधार्य करते हुए बिस्तर की माया त्याग कर द्रुत गति से जगन्माता के साथ साक्षात्कार के उद्देश्य से शिवपुर श्मशान की ओर प्रस्थान किया। उस समय बहुत रात हो गई थी। इतना बोलने के बाद दादा ने और कुछ स्पष्ट नहीं बताया। इसके परवर्ती घटना सिर्फ दादा को ही ज्ञात थी जो हमलोगों के अगोचर थी।

–माँ के कल्याण कामना का निर्देश पालन करने पर

उसका फल मंगलदायक होता है। जो माता आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त हों उसकी कल्याण इच्छा कभी भी विफल नहीं होती। श्रीश्रीबाबा की मातृदेवी श्रीश्रीयुक्तेश्वर गिरिमहाराज की गुरुगतप्राणा एकनिष्ठ क्रियावान थी। श्रीश्रीबाबा अपनी माँ के आदेशों की कभी अवहेलना नहीं करते थे।

प्रसंग (७४) : दादा के घर में दुर्गापूजा चल रही थी, सम्भवतया उस दिन अष्टमी या नवमी थी प्रातःकाल का समय था। दादा ने एक शिष्य को बुलाया और जानना चाहा कि वह क्रिया साधन करता है या नहीं? उत्तर देते हुए उन्होंने कहा -''ठीक प्रकार से नहीं होती, इसबार निश्चित किया है पूजा के पश्चात् शुरु करूँगा।'' उत्तर देते हुए दादा ने कहा –''मात्र पाँच रुपये के विनिमय में क्रिया-साधना के बारे में ज्ञान हुआ इसमें बुराई क्या हैं ? कार्य लिया क्यों था? आजकल तो इतने रुपये के बदले में चाय-बिस्कुट भी नहीं मिलता।'' दादा ने कहा – ''धर्म कार्य करने पर भी रुपया-पैसा लगता है। वर्तमान में रुपये-पैसे के बिना धर्म नहीं होता।''

प्रसंग (७५) : अपना नाम प्रकाशित करने के अनिच्छुक एक नैष्ठिक क्रियावान के मुखनिःसृत गुरुमहाराजाओं के कुछ विशेष घटनाओं के संबंध में –

दादा के मुख निःसृत – दादा तब नांगाबाबा के साथ पहाड़ों में रहते थे। वे दादा को 'बंगाली भूत' कहकर बुलाते थे। एकबार नांगाबाबा को किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाना था, इसलिए दादा पर अन्यान्य गुरु भाईयों की जिम्मेदारी सौंप कर गये थे। इससे दादा अत्यंत प्रसन्न थे – वे सब के निर्देशक थे तथा अन्य सभी उनके निर्देशन में कार्य कर रहे थे। उनके मातहत गुरु भाईयों के सहयोग से दादा ने व्यासपीठ के गुफा के द्वार पर 'गुरुकृपा हि केवलम्' लिखा लताओं-पत्तों से सुशोभित कर एक अपूर्व सुन्दर क्यारी तैयार करवाई। नांगाबाबा जब लौटे तो वे दादा के निर्देशन द्वारा फूल और लता-पत्तों से निर्मित क्यारी देखकर अत्यंत खुश हुए।

एकबार नांगाबाबा दादा को लेकर गभीर जंगल गये; दादा से उन्होंने कहा, ''तुम्हें आज एक महात्मा की समाधियोग में प्राणत्याग की पद्धति दिखाऊँगा।'' तत्पश्चात् वे दोनों यथास्थान में उपस्थित हुए तब दादा ने देखा – एक महात्मा योगमुद्रा में आसीन समाधिमग्न है और उसे वर्तुलाकार में घेर कर अनेक महात्मा विशेष भाव से वन्दना कर रहे हैं। धीरे-धीरे महासमाधि में उपवेशित महात्मा के ब्रह्मतालु का स्थान क्रमान्वय स्फीत होने लगा तथा समवेत महात्माओं ने पहाड़ी जड़ी-बुटियों का प्रलेप मस्तक के उस स्थान में लगाया। तत्पश्चात् क्रमशः वह विशाल आकार धारण कर फट गया और उस स्थान के चहुँओर से रक्तक्षरण होने लगा। इसके पश्चात् सभी ने मिलकर वहीं उनकी समाधि दी। नांगाबाबा ने कहा –''इसीप्रकार उच्चकोटि के महात्मा अपना ब्रह्मरंध्र भेदकर महाव्योम में ब्रह्म में विलीन अवस्था में योगावलम्वन पूर्वक प्राणत्याग करते हैं। वहाँ पर जिस कार्य के लिए सभी का समावेश हुआ था उस कार्य की समाप्ति के पश्चात् सभी वहाँ से चले गये सिर्फ शेष रह गये नांगाबाबा और दादा। नांगाबाबा ने दादा से कहा –''मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ ध्यानयोग में बैठो।'' दादा ध्यान योग में बैठकर गभीर ध्यान में निमग्न हुए। जब बाह्यज्ञान लौटा तो दादा को अत्यंत ठण्ड लग रही थी; ठण्डी जगह में ठण्ड लगना स्वाभाविक ही था, वे तो इसके अभ्यस्त हैं किन्तु आज मानों अस्वाभाविक ठण्ड उन्हें आसनच्यूत कर देगी। तत्पश्चात् हठात् दादा को लगा कि जैसे आसन गतिमान हो रहा है। अकस्मात् दादा ने देखा कि दादा जिसके ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे थे वह एक अजगर प्रजाति का विशाल मोटा साँप था! आसन ने चलना शुरु कर दिया। उसके साथ-साथ दादा भी चलायमान हो रहे थे; किन्तु ऐसी महानिशा में कुछ करने का भी उपाय नहीं था। दादा ने कहा -''तब सिर्फ मैं और सर्प, साँप अपनी स्वाभाविक गति से गतिमय, मैंने तब नांगाबाबा की सिखाई हुई विशेष पद्धति से नांगाबाबा की कुटीर की ओर गमन किया। वहाँ पहुँचकर देखा, नांगाबाबा कुटिया में बैठे हैं और हँस रहे हैं।''

पहाड़ी जीविका के विषय में दादा ने कहा –''समतल से पहाड़ की ऊँचाई पर खाद्यादि और श्रम साधारणतः किसी साधक के क्षेत्र में दुःसाध्यकर है कारण सभी साधक तो वायुभक्षणकारी नहीं है! इसीलिए कोई पर्यटक यदि एक सौ रुपये के बदले में किसी साधु को दो सुखीरोटी भी दे देता है तो साधु बहुत खुश होता है। यद्यपि इन सबका विकल्प है जो उसका सन्धान जानते हैं।

'चमरी गाय' का अतिरिक्त दूध मिट्टी में जमी हुई अवस्था में पाने पर उसका सेवन अथवा पहाड़ों के गभीर

जंगल में एक प्रकार का ऐसा फल मिलता है जिसके भीतर असंख्य छोटे छोटे दाने रहते हैं; यदि सामान्य दो दानों का भी भक्षण किया जाय, तो दो-तीन दिन क्षुधा-तृष्णा तथा सब प्रकार की क्लान्ति से छुटकारा मिलता है। *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

उन्मेष

(२९)

सत्संग में श्रीश्रीमाँ –(पंचमी दिनांक - १४/०५/०९)

प्रश्न – क्या 'समाधि' योगी जीवन का मूल लक्ष्य है?

श्रीश्रीमाँ – योगी जीवन का मूल लक्ष्य पूर्ण सत्ता का दर्शन एवं महाज्ञान में उपनीत होना उचित है। 'समाधि'

अवस्था उस पूर्णसत्य को ज्ञात होने की एक अवस्था विशेष है। नीचे मूलाधार से ऊर्द्ध में सहस्त्रार पर्यन्त प्रत्येक चक्र या सर्व्वव्यापी चेतना के प्रत्येक स्तर पर योगी को अष्टांग योग के अष्टपादादि को (अर्थात् - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि) आयत्ताधीन करना पड़ता है। समाधि का अर्थ सिर्फ संज्ञा खो देना नहीं है। समाधि का अर्थ है 'समरस्यता प्राप्ति', प्रत्येक चक्र के सृष्टितत्त्व के मौलिक तत्त्वों को जानने के लिए प्रत्येक स्तर पर ही योगी को स्वयं की चेतना को जाग्रत करना पड़ता है। यह सही है कि प्रथमावस्था में समाधि होने पर संज्ञा उस निर्दिष्ट ध्यान केन्द्र के संग एकीभूत हो जाने पर योगी की तब योगयुक्त अवस्था में बोधि-चेतना लुप्त हो जाती है किन्तु एक ही लक्ष्य पर बारम्बार योगयुक्त होने के लिए क्रमशः समाधि अवस्था की भी एक प्रकार परिपक्व अवस्था लाभ होती है। तब समाधि में भी योगी की चेतना या संज्ञा सम्पूर्ण विलुप्त न होकर अस्तित्वबोध-सह-बोधि की सहायता से योगी लक्ष्य केन्द्र का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है, समाधि में प्रथमतः परोक्ष ज्ञान होता है एवं समाधि परिपक्व हो जाने पर प्रत्यक्ष ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था को यौगिक भाषा में 'सचल समाधि' कहा जाता है। सचल-समाधि अवस्था प्राप्त न होने पर्यन्त योगी को पूर्णसत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता।

पूर्णसत्य का ज्ञान लाभ करने के लिए ओंकार की साधना करनी पड़ती है। ओंकार को सृष्टि के यन्त्र रूप में, ओंकार को ब्रह्मज्योतिरूप में, ओंकार को शब्दब्रह्मरूप में एवं ओंकार को महत्तत्त्वरूप में गुह्यातिगुह्य योग एवं तंत्रविद्या द्वारा प्रत्यक्षरूप में ज्ञात कर योगीगण ओंकाररूप परमब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

प्रश्न – माँ, हमारा मन इतना चंचल है कि हमारे जैसे साधारण मनुष्यों द्वारा क्या ओंकार साधना करना सम्भव है?

श्रीश्रीमाँ – देखो, मन की चंचलता को आत्मसत्ता का दोष मत मानों। मन की चंचलता है भगवान का एक आशीर्वाद। मन चंचल होने के कारण ही तो उसे लेकर किसी भी चेतना की भूमि या अवस्था में स्थापन कर योगी योगयुक्त हो सकता है। अतएव, सद्गुरु के उपदेशानुयायी मन को सहज सरल कर, सद्गुरु के प्रति अटल विश्वास पर दृढ़ रहकर गुरुप्रदत्त विद्या साधन करते जाओ, देखोगे कि अन्जाने ही तुम या तुम्हारी आत्मसत्ता की चेतना साधारण जीवचेतना से असाधारण शिवचेतना में एकदिन रूपान्तरित हो जायेगी। सिर्फ 'ओंकार' ही क्यों, निःशब्द की भूमि पर भी एकदिन तुम्हारी चेतना की बोधि पहुँच जायेगी – आलोक एवं अन्धकार, दोनों का ज्ञान सम्पूर्ण होने पर योगी का अखंड महायोग सम्पूर्ण होता है। *...क्रमशः*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

आगामी अनुष्ठान सुची

होली - ९ मार्च, सोमवार
अध्यात्मिक सभा – २२ मार्च, रविवार
अन्नपूर्णा पूजा – १ अप्रैल, बुधवार
राम नवमी – २ अपैल, वृहस्पतिवार
प्रथम बैशाख – १४ अप्रैल, मंगलवार, सन्ध्यामे श्रीश्रीमा के सद्उपदेश।

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्रीअमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्रीकिशोरीमोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९) शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

गतांक से आगे...

मुक्ति द्वारा जीव का नाश नहीं होता। निर्वाण-मुक्ति का यह अर्थ नहीं है। अगर नाश ही प्राप्त होता तो कोई भी उसके लिए प्रयत्न नहीं करता; क्योंकि अपना नाश कोई नहीं चाहता एवं ऐसा होने पर परम हितैषिणी श्रुति भी उस विषय में उपदेश नहीं देती।

जीव मुक्तावस्था प्राप्त होने पर लोक व्यवहारादि संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। जीवन्मुक्त गुरु शिष्य को मुक्ति का उपदेश प्रदान करते हैं। यही श्रुति में तथा अन्य सभी शास्त्रों में कथित है। वे यदि वाह्य-जगत् के संबंध में चेतनाविहीन होते तो फिर उपदेश कैसे दे पा रहे हैं। जीवन्मुक्त होने पर भी देह अनेक दिनों तक कायम रह सकती है। जीवन्मुक्त होने पर देह नहीं रहेगी यह भ्रम है। अवशिष्ट कर्मफल भोगने हेतु देह अस्तित्व में रहती है। भगवद्गीता में उद्धृत है – 'जन्मबंधविनिर्मुक्तापदम् गच्छन्त्यनामयं।' इसका अर्थ है – उपासक जन्मबंधन से मुक्त होकर अनामय पद प्राप्त करता है। 'आमय' शब्द का अर्थ है रोग, पीड़ा। 'अनामय' शब्द का अर्थ है रोगशून्य। जैसे कोई पहले रोगग्रस्त है तथा बाद में चिकित्सा द्वारा औषध और पथ्य सेवन से रोगमुक्त होते है, उसी प्रकार परमात्म तत्त्वज्ञानशून्य जीव उपासना द्वारा भवरोग से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानोदय एवं ज्ञानोदय से मुक्ति साधन का स्वाभाविक फल है। वह कभी न कभी अवश्य मिलेगी। भगवद्गीता में उद्धृत है – 'अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते विदितात्मनां।' इसका अर्थ है – आत्मतत्त्व से अवगत होने पर इहकाल और परकाल उभय अवस्थाओं में ब्रह्मनिर्वाण। मृत्युपरांत ही केवल कैवल्य या ब्रह्मनिर्वाण होगा ऐसा नहीं है। काया कायम रहते हुए भी यह संभव है। ईश्वर भक्तगण ईश्वर के सेवापरायण होते हैं। वे भगवत्सेवा परित्याग कर त्रिलोक का साम्राज्य या मुक्ति कुछ भी नहीं चाहते। इसीलिए श्रीमद्भागवत् में उक्ति है –'दीयमानं न गृह्णाति विनामत्सेवनं जनाः। मुक्ति इत्यादि उसे प्रदान करने पर भी वे उसे ग्रहण नहीं करते। इसे ही ईश्वरभक्त के लक्षण कहते हैं। मुक्ति की अपेक्षा सेवा को ही वे श्रेष्ठ मानते हैं। किन्तु उस प्रकार की ईश्वर आराधना के फलस्वरूप ज्ञानोदय और मुक्ति अनिवार्य रूप से उपलब्ध होती है। ईश्वर सेवा-भक्ति प्रिय है यह सत्य है। परन्तु ऐसे भक्त को अपने सेवा हेतु अधिक दिनों तक वे बंधनग्रस्त रखना नहीं चाहते। ईश्वर सर्वकर्मफलदाता। साधन-कर्म के भी फलदाता हैं। यही उनकी नीति है। उनका भक्त इस शरीर में अवस्थान करे या शरीर त्याग दे वह अवश्य ही ज्ञानोदय द्वारा मुक्तिलाभ करता है।

देह रहते हुए मुक्तिलाभ होने पर अब ईश्वर भक्ति नहीं रहेगी, ऐसी कल्पना भी उचित नहीं है। सनक, सनंद, सनातन, सनत्कुमार इत्यादि मुक्त होने पर भी ईश्वर-भक्त थे। वे भक्ति के आचार्य थे। मुक्तपुरुषगण ही भक्तितत्त्व के उपदेशक होते हैं।

भक्तगण कहते हैं मुक्ति भक्ति की दासी है। क्योंकि आश्रय ग्रहण करने पर मुक्ति अपने आप आ जाती है। ज्ञानोदय और मुक्ति भक्तियोग के उपासना का अवश्यम्भावी फल हैं। भगवद्गीता के प्रायः प्रत्येक अध्याय में ज्ञान और भक्ति की प्रशंसा देखी जाती है। ये उभय ही शास्त्रसम्मत। इनके परस्पर विरोधी होने पर केवल एक की ही प्रशंसा होती उभय की नहीं। भक्तिमार्ग के अनेक उपासक ज्ञान को भक्ति का विरोधी समझते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञानमार्गी, कई उपासक भक्ति को ज्ञान का विरोधी मानते हैं। किन्तु वस्तुतः ज्ञान और भक्ति परस्पर विरोधी नहीं हैं। अद्वैतवादीगणों को उपासना हेतु शास्त्रीय द्वैत का सहारा लेना पड़ता है यह वे स्वीकार करते हैं। गुरुमुख से या शास्त्र से तत्त्वकथा श्रवणपूर्वक उपासना ये सब शास्त्रीय द्वैत के ही अंग हैं। उनमें से सभी लोग ईश्वर आराधना के विरोधी हैं ऐसी बात नहीं है। उनमें से भी कई भक्तियोग द्वारा ईश्वर आराधना को अद्वैत-ज्ञान से युक्त कर ग्रहण करते हुए देखे गये हैं। इसीप्रकार भक्तिमार्गी उपासकों में भी बहुतों को अद्वैत-तत्त्व का आश्रय ग्रहण करते हुए देखा गया है। श्रुति उपदेशानुसार

ईश्वर को सर्वभूतात्मरात्मा जानकर वे अभेदरूप से उसका भजन करते हैं।

ज्ञान और भक्ति को परिपूरक भाव में एक दूसरे के पोषक के रूप में जानना ही उचित है। ईश्वर के संबंध में कुछ ज्ञान गुरु और शास्त्र से अर्जित कर बाद में भक्तिमार्ग की उपासना होने लगती है। भक्तिमार्ग की उपासना द्वारा सर्वदा उसके चिंतन से क्रमश: ब्रह्मज्ञान अधिगम होता है एवं ब्रह्मविषयक ज्ञान की भी वृद्धि होती है। पहले भेदाभेद विचार होने पर भी चित्तशुद्धि वशत: अभेदभाव में भजन स्वत: ही प्रवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात् ज्ञानोदय से मुक्ति साधित होती है। भक्तिपथ में साधन के द्विविध सोपान के विषय में भक्तिशास्त्र में वर्णित है – यथा - गौणभक्ति, पराभक्ति। गौणभक्ति में सर्वप्रथम द्वैतभाव में उपासना होती है। बाद में पराभक्ति द्वारा अभेदभाव में उपासना होती है। पराभक्ति अतिसूक्ष्मा, तीव्रा एवं अमृतस्वरूपा तथा ज्ञान- लक्षणा है। भगवद्गीता के अष्टादश अध्याय में यह उक्ति है–

'ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यत् समुपाश्रित:।
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते।।
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति।
सम: सर्वेषु भूतेषु मद्‌भक्तिं लभते पराम्।।'

इसका अर्थ – 'ब्रह्मभूत:' शब्द का अर्थ है - अपगत रजस्तमो मल:। उपासना करते करते चित्त से रजो एवं तमो मल अपगत होकर चित्त विशुद्ध होकर सत्त्वगुण रूप में स्थित होता है। तब चित्त की प्रसन्नता, आकांक्षा-शून्यता, शोक-शून्यता, सर्वभूतों में समदृष्टि इन सारे गुणों का आगमन होता है। उसी अवस्था में ज्ञान-लक्षणा पराभक्ति का उदय होता है। तत्पश्चात् उन्होंने कहा – 'भक्त्या मामभिजानाति यावाम् यश्चास्मि नत्त्वत:। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदानन्तरं।' यहाँ 'भक्त्या' शब्द का अर्थ है – परयाभक्त्या अर्थात् पराभक्ति द्वारा। 'अभिजानाति' शब्द का अर्थ है – विशेषरूप से जानते हैं। पहले कुछ-कुछ ज्ञान ईश्वर संबंध में अवश्य ही हुआ था। यहाँ विशिष्ट ज्ञान का उदय होकर किस तरह परमात्मा को जानते हैं यह कहा गया है। 'यावाम्' अर्थात् परमात्मा कितने विशाल है, अर्थात् वे सर्वव्यापी हैं यह वे (भक्त) जानते हैं। वे (परमात्मा) तत्त्वत: सच्चिदानंदरूप हैं यह भी वे(भक्त) जानते हैं।

भगवद्‌गीता में जहाँ 'तत्त्वत:' शब्द का व्यवहार किया गया है, वहाँ उनका (परमात्मा) गुणातीत सच्चिदानंद स्वरूप तत्त्व ही कथित है। 'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा' इसका अर्थ है – उनका निर्गुण, मायातीत, सर्वातीत स्वरूप सच्चिदानंद रूप में ज्ञानोदय होता है, यही है 'तत्त्वत:' शब्द का अर्थ। उन्हें तत्त्वत: जानने पर क्या होता है इसे ही समझा रहे हैं – विशते तदनन्तरं अर्थात्, उनमें (ईश्वर) ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इसे ही निर्वाण-मुक्ति या कैवल्य-मुक्ति कहते हैं। इस संदर्भ में पहले कहा जा चुका है – अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते विदितात्मनां। आत्मज्ञान के उदय होने पर, इस काया के जीवित रहते हुए एवं देहांत होने पर भी ब्रह्मनिर्वाण होता है। यही है संपूर्ण ब्रह्मप्राप्ति। श्रुति में भी यह उक्त है – 'ब्रह्मापि सन् ब्रह्माप्नोति' – इसका अर्थ है – वे पहले ब्रह्म नहीं थे अब ब्रह्म हुए, ऐसा नहीं है। उन्होंने ब्रह्म होकर भी सर्वोपाधि वर्जित होकर सम्पूर्ण रूप से ब्रह्म को प्राप्त किया। वे तब परिपूर्ण शान्ति एवं परमानन्द प्राप्त करते हैं।

कोई-कोई कहते हैं, भक्तियोग द्वारा आराधना में ही रस है, निर्वाण या कैवल्य मुक्ति में रस नहीं है। यह भ्रान्ति है। श्रुति में कहा गया है –'रसो वै स:, आनन्दं वै स:। आनंदेन सह आनंदी भवति।' इसका अर्थ परमात्मा रस स्वरूप, आनन्द स्वरूप। उसे प्राप्त कर जीव आनन्दमय हो जाता है। श्रुति ने उनका अखण्डैव-रस के रूप में वर्णन किया है। पूर्ण अनंत रस के वे सागर हैं। उस सागर से अत्यल्प रस क्षरित होकर उपासक को मत्त कर देता है। पूर्ण रस भंडार में रस का अभाव नहीं है। जीव मुक्त होकर उसी पूर्ण अखंड रस का भागी बनता है। अतएव मूल में रस न हो और शाखा-प्रशाखा में रस है यह धारणा असंभव है। श्रुति में कहा गया है –'यथा जले जल सिक्तं' इत्यादि – जैसे समुद्र से कुछ जल उठाकर बाद में जब वही जल समुद्र में डाला जाय तब फिर उस जल की पृथकता समाप्त हो जाती है, वैसे ही अखंड चैतन्य में मिलकर उस जीव का अनंतत्व साधित होता है। वेदांत दर्शन में उक्ति है – 'अतोहनंतेन तथाहि लिंगम्।' उस अखंड चैतन्य का कोई प्रकृत विभाग नहीं है। वे निरंश हैं, अंश कलाविहीन हैं। विदेह मुक्ति काल में यही अभिव्यक्त होता है।

...क्रमश:

–हिन्दी अनुवाद: मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

महर्षि भरद्वाज के पुत्र 'द्रोणाचार्य' महाभारत के एक सुप्रसिद्ध चरित्र थे। एकसमय महर्षि भरद्वाज का घृताची अप्सरा को देखकर रेतः स्खलित हुआ। उस ओजस्वी वीर्य को उन्होंने एक द्रोण (कलशी) में रक्षित किया एवं उनके तपोबल से उसमें से एक पुत्र ने जन्मग्रहण किया। द्रोण से जन्म हुआ इसीलिए पुत्र 'द्रोण' नाम से विख्यात हुआ। महर्षि अग्निवेश्य महर्षि भरद्वाज के शिष्य थे। भरद्वाज ने किसी एक समय में उन्हें एक आग्नेयास्त्र प्रदान किया था। जिसे परवर्ती समय में अग्निवेश ने गुरुपुत्र द्रोण को प्रदान किया। द्रोण ने क्रमशः पिता से समग्र वेद-वेदांग का अध्ययन किया। पांचाल राज्य के अधिपति पृषत नाम के नरपति महर्षि भरद्वाज के परम सखा थे। उनके यहाँ द्रुपद नाम के एक पुत्र ने जन्मग्रहण किया। द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज के आश्रम में गमन कर द्रोण के साथ क्रीड़ा और शास्त्र का अध्ययन करते थे। कुछ समय पश्चात् नरपति पृषत के परलोक गमन करने पर महावीर द्रुपद समग्र उत्तर पांचाल के अधिपति होकर राज्यशासन करने लगे। इसी बीच महर्षि भरद्वाज के भी स्वर्गारोहण करने पर महर्षि द्रोण पैतृक आश्रम में रहकर कठोर तपस्या में निमग्न हुए। परवर्तीकाल में द्रोण ने महर्षि शरद्वान की कन्या कृपी से विवाह किया एवं धर्मपरायणा कृपी ने 'अश्वत्थामा' नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उसी समय महात्मा जमदग्निनन्दन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को सर्वस्य प्रदान कर रहे हैं ऐसा सुनकर द्रोण ने उनकी पादवन्दना की। परशुराम ने उनके अभिप्राय से अवगत होकर उन्हें अस्त्रशस्त्रादि विद्या और उनके समस्त रहस्य तथा धनुर्वेद-विद्या प्रदान की। द्रोण ने परशुराम से इन समुदय विद्याओं को प्राप्त कर परम हर्षित मन से अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास उपस्थित होकर कहा ''राजन्! मैं तुम्हारा सखा हूँ!'' द्रुपद ने तब ऐश्वर्य मद में मत्त होकर द्रोण की अवहेलना की और उसे अपमानित कर कहा –''मेरी तरह ऐश्वर्यशाली भूपति के साथ तुम्हारे सदृश श्रीहीन निर्धन मनुष्य की किसी तरह भी मित्रता नहीं हो सकती।'' द्रोण द्रुपद के ऐसे कठोर वचनों को श्रवण कर अत्यंत व्यथित हुए और उसी समय उस स्थान से प्रस्थान किया। उसके पश्चात् द्रोण हस्तिनानगर में जाकर निज श्यालक कृपाचार्य के गृह में वास करने लगे। इसी बीच महात्मा भीष्म ने उनके परिचय से अवगत होकर उन्हें कौरव और पाण्डवों के शिक्षागुरु के रूप में नियुक्त किया तथा उन्हें प्रचुर धन सम्पदा प्रदान कर उनके लिए सुरम्य वासगृह का निर्माण करवाया। वहाँ पर अस्त्र शिक्षार्थ सभी के समवेत होने के पश्चात् आचार्य द्रोण ने शिक्षार्थियों से कहा –''शिक्षा समापनान्त मेरे एक कार्य का सम्पादन करना होगा।'' द्रोणाचार्य के इस वाक्य को सुनकर दुर्योधनादि सभी खामोश हो गये, केवल अर्जुन ने कहा –''चाहे जितना भी कष्टकर क्यों न हो मैं आपके कार्य का सम्पादन करूँगा।'' यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने अर्जुन का आलिंगन किया तथा उनके चक्षुओं से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय पश्चात् अस्त्रशस्त्र के ज्ञान से सभी कृतविद्य हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी अस्त्रशिक्षा की परीक्षा भी ली। तब द्रोण ने छात्रों से कहा, ''तुमलोग पांचाल राज द्रुपद को रणक्षेत्र से पकड़कर लाओ। यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा होगी। यह सुनकर कौरव-पाण्डव सभी ने युद्धार्थ गमन किया, किन्तु अन्य सभी परास्त हुए, केवल अर्जुन ने अति विशिष्टता पूर्ण कठोर युद्ध में द्रुपद को परास्त किया तथा उसे और उसके सचिव को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य को उपहारस्वरूप भेंट किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हृतसर्वस्व, भग्नदर्प और वशतापन्न देखकर कहा –''हमलोग ब्राह्मण तुम्हारे प्राणों का नाश नहीं करेंगे, परन्तु समग्र राज्य भी लौटाकर नहीं देंगे। भागीरथी का दक्षिणी किनारा तुम्हारा एवं उत्तरी किनारा मेरा रहेगा।'' इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद के साथ मित्रता स्थापित की। परवर्ती समय में महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के हस्त से ही द्रुपद निहत हुआ एवं द्रुपद के तपोलब्ध पुत्र धृष्टद्युम्न के हस्त से द्रोणाचार्य निहत हुए। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य पाँच दिनों तक युद्धोपरांत समरशायी हुए। उस समय तक वे ८५ वर्ष के हो चुके थे।

पूर्व में काशीस्थित 'द्रोणेश' नामक एक शिवलिंग पूजा के फल से द्रोणाचार्य ने पुनराय ज्योतिर्मय देहधारण कर उत्तम स्वर्गलोक में गमन किया।

(सहायक ग्रंथ : महाभारत और स्कन्दपुराण)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ वें पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

११। (पत्र ११, प्र: १) - (प्रथम भाग) जगत् में जो समस्त आध्यात्मिक मार्ग योगमार्ग के रूप में परिचित हैं। उन सबों को हमारी दृष्टिकोण से योगमार्ग नहीं कहा जा सकता। उनमें से अधिकांश ही साधनमार्ग के विभिन्न भेद है। किसी-किसी में योग का संबंध हो भी सकता है। साधन-मार्ग में कर्म, ज्ञान, भक्ति हैं। योगपथ में भी है; परन्तु उभय का पार्थक्य अति स्पष्ट है। बौद्धों में 'हीनयान पथ' है साधनपथ एवं 'महायान पथ' को योगपथ कहा जा सकता है। हमलोगों में षड्दर्शन के अनुसार अनुशीलन प्रणाली ये सब ही साधनपथ हैं। ऐसा है कि प्रचलित वेदान्त साधन भी साधनपथ ही है योग नहीं। पातंजल योग भी साधन ही है योग नहीं – इस विषय पर श्रीश्रीमाँ के विचार।

उत्तर – (पत्र ११, प्र: १, प्रथम भाग) – साधन और योग इन दो विषयों का पार्थक्य समझाने के क्रम में कविराज महाशय ने बौद्ध धर्म के 'हीनयान' पथ को साधनपथ तथा 'महायान' पथ को योगपथ कहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम हमलोगों को हीनयान एवं महायान का मतलब समझना होगा। हीनयान पथ के साधक बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वातिवादी कहा गया है। दूसरी तरफ महायानीगण वाह्यवस्तु के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। हीनयानी हुए Realists या वस्तुवादी एवं महायानपथवाले कहलाए भाववादी या Idealists; महायान पथावलंबी शून्यवाद और योगाचारवाद या विज्ञानवाद को स्वीकार करते हैं। हीनयान पथावलंबी दर्शनानुयायी वस्तु का अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप में नहीं ज्ञात होता (सौत्रान्तिक), जो अनुमान सापेक्ष है; तथा हीनयान के दूसरे मतानुसार बाह्यवस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है (वैभाषिक)। महायानपथवाले हैं भाववादी जो दो शाखाओं में विभक्त हैं –(१) योगाचार (विज्ञानवाद) (२) माध्यमिक (शून्यवाद)। बौद्ध दर्शन के इन दोनों पथों – हीनयान को साधनपथ एवं महायान को योगपथ के रूप में श्रीकविराज महाशय ने परिभाषित किया है।

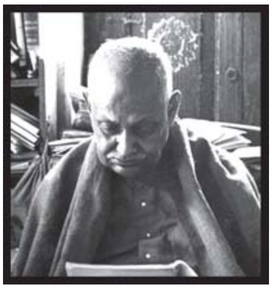

इस प्रसंग में श्री अक्षय दत्तगुप्त महाशय ने अपने 'ज्ञानगंज' नामक लेख में कहा है –''मूल तथ्य है साधन बिना सिद्धि नहीं। हीनयान मत में बुद्ध ने केवल पथ दिखलाया है, साधक को अपने प्रयास से चलना होगा। महायान मत में बोधिसत्त्व और थोड़ा निकट आकर एवं अपने अनंत पुण्य का विभाजन कर थोड़ा अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। क्योंकि वे ध्यानी बुद्ध के कृपावतार हैं। महायान का आदर्श स्वतंत्र हैं। वह आदर्श है बोधिसत्त्व। बोधिसत्त्व इस शब्द के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं पहला है, वे जन्मजन्मांतर साधन द्वारा दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान एवं प्रज्ञा इन छ: गुणों या धर्म का पारमिता अर्थात् पराकाष्ठा प्राप्त कर बुद्धत्व में सन्निहित हुए हैं किन्तु जगत् के समस्त जीवों का दु:ख एवं दुर्गति देखकर अपार करुणावश यह प्रतिज्ञा किये हैं कि जितने दिनों तक एक भी जीव निर्वाण से वंचित रहेगा उतने दिनों तक वे बुद्धत्व का वरण नहीं करेगें, सभी जीवों के श्रेय साधन में सहयोगी रहेंगे। द्वितीय है, महायान मतवाद में सर्वोच्च तत्त्व हैं ध्यानी बुद्ध; ये मनुष्यरूपी बुद्ध नहीं हैं। बोधिसत्त्व उसी ध्यानी बुद्ध के अवतार। जगत् के पूर्वोक्त रूप श्रेय साधनार्थ स्वयं को बुद्धत्व के किंचित निम्न अवस्था में प्रतिस्थापित। यथार्थत: दोनों अर्थों को समन्वित कर बोधिसत्त्व दर्शन की धारणा एवं आदर्श रखा गया है। एक तरफ निम्न से ऊर्ध्व का आरोहण, दूसरी तरफ ऊर्ध्व से निम्न का अवरोहण। ज्ञानगंज के प्रत्येक परमहंसगण साधन द्वारा उन्नत होकर स्वयं के मोक्ष या निर्वाण को तुच्छ समझकर जगत् उद्धार कार्य हेतु प्रयत्नशील हैं, इनमें से

प्रत्येक ही बोधिसत्त्व के समतुल्य हैं।''

योगसाधन पथ में निम्नावस्था से ऊर्ध्व का आरोहण ही हुआ 'योग'। उस योग अवस्था द्वारा क्रमश: साधक योगी बनकर निर्वाण पद को उपलब्ध करते हैं और बोधिसत्त्वगण 'योग' से अवतरण कर सद्‌गुरु पद पर अधिष्ठित होकर लोक-कल्याण निमित्त मनुष्य को साधनपथ प्रदर्शन एवं दीक्षादान के माध्यम से शिष्य को चैतन्य-शक्ति प्रदान कर जन्मजन्मांतर में निर्वाण पद पर अरोहण हेतु साधनपथ प्रदर्शित करते हैं। ज्ञानगंज के महातपा महाशय को महायोगासीन ध्यानी बुद्ध समझने पर उनकी शक्ति और प्रभाव बोधिसत्त्व स्थानीय भृगुराम आदि परमहंस के मध्य जो अवतरित हुई है, वह अवश्य ही अनुमेय है – इस स्तर में ऊर्ध्व से निम्न में अवतरण अर्थात् अवतार का कर्म। अतएव अवतार के कर्म को ही 'योगमार्ग' कहा जाता है। योगीश्वरों का कर्मपथ ही हुआ योगमार्ग। साधक का साधन-पाद है साधनमार्ग, जहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति है – यह आत्मज्ञान उपलब्धि के पर्याय के अन्तर्गत है और योगपथ में जो कर्म, ज्ञान, भक्ति यह हुआ योगी का स्वप्रकाश स्वभाव मात्र। इसीलिए कहा गया है कि अनुशीलन प्रणाली सारे है साधनपथ, योग में उपनीत होने के प्रयासरूप साधक का पथ। और योग हुआ उपयुक्त विशुद्ध सत्ता में सद्‌गुरु का शक्ति परमाणु आरोप के कारण आत्मज्ञ शिष्य के आधार में जो पूर्णत्व का जागरण होता है अर्थात् शिवत्व का पूर्णरूप। *...क्रमश:*

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भगवत् कथा

नदीमातृका गोदावरी कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

युगावसान काल में बालकरूपी श्रीहरि ने मार्कण्डेय ऋषि को अपने उदर में आश्रयदान कर उनकी प्राण रक्षा की थी। मार्कण्डेय ऋषि ने उस समय श्रीहरि के उदर में अनेक नदियों का आश्रित अवस्था में दर्शन किया। उनमें से पुण्यतमा 'गोदावरी' नदी अन्यतमा थी।

गोदावरी नदी का अन्य नाम 'गौतमी गंगा' भी है। पुराण की एक कहानी से इस नामकरण की पुष्टि होती है। महर्षि गौतम ने एकबार गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए महादेव की उपासना की थी। गौतम की उपासना से संतुष्ट होकर महादेव ने उन्हें वर प्रार्थना करने के लिए कहा। महर्षि गौतम ने महादेव से उनके जटास्थित गंगा नदी को मर्त्य में प्रवाहित कराने के लिए वर माँगा। तब महादेव ने अपनी जटा में रक्षित गंगानदी को ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर संस्थापित किया। महर्षि गौतम ने प्रार्थना की कि, ब्रह्मगिरि से गंगा की पवित्रधारा भूपृष्ठ पर जितनी दूर पर्यन्त प्रवाहित होगी उतनी दूर तक का भूभाग पवित्र जल के स्पर्श से परिपूर्ण होकर कलुष मुक्त हो जाए। महर्षि गौतम ही गंगा की इस पवित्र धारा को मर्त्य में लेकर आए इसीलिए इसका नाम 'गौतमी गंगा' है। प्रकृतपक्ष में यह गोदावरी नदी है। स्वर्ग में वरुणदेव की सभा में जो सब नदियाँ उपयुक्त मातृका-देह धारण कर उपासना करती है, उनमें से गोदावरी अन्यतमा है। इस नदी के तट पर अनेक तीर्थों का अवस्थान है। पुराण में गोदावरी नदी को सहस्त्र शिवलिंग विशिष्ट तीर्थ के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी के पवित्र जल से स्नान करने पर गोमेध यज्ञ का फल मिलता है एवं वासुकि-लोक की प्राप्ति होती है। दक्षिण-भारत की इस नदी के किनारे अनेक मनोरम वनभूमि और उद्यान है। महाभारत के पाण्डवों ने वनवासकाल में एकबार गोदावरी नदीतीर्थ का दर्शन किया था।

गोदावरी भारत की द्वितीय वृहत्तम तथा अन्यतम पवित्र नदी है। सह्याद्रि पर्वत इसका उत्सस्थल है सह्याद्रि के उत्तरांश के जिस जगह से गोदावरी उत्पन्न हुई है, वायु-पुराण में उसे अति मनोरम स्थान कहकर उल्लिखित किया गया है। सुबराज गोवर्द्धन ने उस स्थान में ही एक नगर का निर्माण किया। ऋषि भरद्वाज ने भी उसी जगह पर भगवान श्रीरामचन्द्र के लिए पर्वत, वृक्ष इत्यादि का सृजन किया था।

रामायण में रामचन्द्र के वनवास की स्मृतियाँ गोदावरी नदी के साथ ओतप्रोत भाव से संश्लिष्ट है कारण गोदावरी नदी के तट पर ही पंचवटी के वन में अवस्थान के समय की राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास की स्मृतियाँ जुड़ी

हुई है। रामायण के अरण्यकाण्ड में श्रीरामचन्द्र के मुखनिःसृत गोदावरी एवं उसके तीरवर्ती अंचल की अपूर्व वर्णना मिलती है। भगवान श्रीराम ने गोदावरी को फूलों, वृक्षों से सुसज्जित एक सुरम्य नदी के रूप में वर्णित किया था। इस नदी के किनारे प्रकृति की गोद में मृग स्वच्छंदता और निर्भयता से विचरण करते थे। यह गोदावरी ही सीतादेवी को अतीव प्रिय थी। लंकापति रावण जब सीता को हरण करने के लिए पंचवटी में आया, तब राक्षस कुलपति के भय से गोदावरी नदी का जल ह्रासित हो गया। अपहृत देवी सीता ने भी गोदावरी नदी के निकट प्रार्थना की उनका अपहरण का संवाद रामचन्द्र के निकट पहुँचाने के लिए। भगवान श्रीराम ने भी गोदावरी नदी के निकट सीता की तलाश की थी। सीताहरण के पश्चात् सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के प्रधान को सीतादेवी के खोज में अनेक नदियों और जनपदों में प्रेरण किया था। उनमें से गोदावरी नदी अन्यतमा थी।

वेदों में भी गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है। वेदों में कहा गया है कि गोदावरी नदी हव्यवहनकारी पवित्र अग्नि की उत्स-स्थल है। उस समय आर्य और म्लेच्छ उभय जातियों के मनुष्य पवित्र गोदावरी नदी का जल पान करते थे। अर्थात् यह नदी सम्पूर्ण मनुष्यों की उपजीव्य थी।

गोदावरी भारत की द्वितीय दीर्घतम नदी है। महाराष्ट्र के त्र्यम्बकेश्वर के निकट पश्चिमघाट पर्वतमाला से उत्सारित गोदावरी नदी तैलंगाना और आन्ध्रप्रदेश के मध्य से प्रवाहित होते हुए बंगलासागर में पतित होती है। त्र्यम्बकेश्वर से गोदावरी की जो शाखा प्रवाहित हुई है स्थानीय लोगों के निकट वह आज भी 'गौतमी गंगा' के नाम से परिचित है। महर्षि गौतम और गौतमी-गंगा की कहानी का स्मरण कर त्र्यम्बकेश्वर के निकट आज भी द्वादश वत्सर के पश्चात् एक मेले का आयोजन होता है।

महर्षि गौतम कर्तृक गौतमी-गंगा के मर्त्य में आगमन की कथा :-

ब्रह्मा के कमण्डल से निर्गत गंगा देवी पार्वती के सदृश ही महादेव की प्रिय पत्नी हैं। गंगा देवी सर्वदा स्वामी शिव के जटाजुट में अवस्थान करके रहती है। वे भगवान शिव की परम प्रिया एवं शिव भी गंगा के प्रति विशेष भाव से आकृष्ट है। इस पर निरुपाय पार्वती ने स्वामी के ऊपर अभिमान कर, सब माया परित्याग कर हिमालय में तपस्या करने जायेंगी ऐसा मनस्थ किया। पुत्र विनायक - गणेश तब माँ का दुःख सहन नहीं कर पाए। तब उन्होंने माता पार्वती को क्षणिक सान्त्वना देकर स्कन्द कार्तिकेय और मातृसखी जया के साथ उपस्थित परिस्थिति के विषय में चर्चा करेंगे ऐसा निश्चित किया। ठीक उसी समय एक स्थान पर चौदह वर्षों से निरंतर हो रही भयंकर अनावृष्टि का दृश्य देखा गया। जलाभाव से पृथ्वी तब प्रायः ध्वंस होने की अवस्था में थी। परन्तु महर्षि गौतम ने उस भयंकर प्राकृतिक आपदा में भी हिम्मत नहीं हारी। नारद ने उस समय ब्रह्मगिरि में एक तपस्या का आयोजन किया। महर्षि गौतम यह संवाद पाकर ब्रह्मगिरि में उपस्थित हुए एवं वहाँ अपना आश्रम स्थापित कर रहने लगे। तब अन्यान्य ऋषि भी गौतम ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए क्योंकि प्रकृति के प्रकोप से जीवन रक्षा का वही एकमात्र उपाय था। विनायक -गणेश भी ब्राह्मण के वेश में जया को साथ लेकर गौतम आश्रम में उपस्थित हुए क्योंकि गंगा को मर्त्य में आनयन की क्षमता एकमात्र प्रभावशाली महर्षि गौतम में ही थी।

ब्राह्मणवेशी विनायक ने कुछ समय तक आश्रम में रहने के पश्चात् अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ अन्यत्र जाने की अनुमति गौतम ऋषि से माँगी। किन्तु प्रीतिवशतः गौतम ऋषि ने उन्हें आश्रम त्याग नहीं करने दिया। विनायक ने ऋषि के अनुग्रह विषय पर ब्राह्मणों के साथ युक्ति-तर्क शुरु कर दिया। तय हुआ की महर्षि गौतम के माध्यम से विनायक ऐसा समाधान करेंगे कि जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का वृहत्तर कल्याण साधित होगा। गणेश ने माँ का अभिप्राय स्मरण कर जया को निर्देश दिया कि गोपनीयता से गोरूप धारण कर गौतम ऋषि के सम्मुख उनके आश्रम संलग्न क्षेत्र में शालिधान भक्षण और नष्ट करना होगा। गौतम द्वारा उसे सामान्यतम ताड़ना करने पर आर्तस्वर में वे धरती पर जीवन्मृत के सदृश गिर जायेंगी। तब गो-रूपी जया ने अविलम्ब ही निर्देश के अनुसार कार्य किया। महर्षि गौतम कर्तृक धावित गाय को मृत सोचकर ब्राह्मण तत्क्षण ही गोहत्या पाप के कारण तपोर्जित क्षमता क्षय होने के भय से आश्रम त्याग के लिए उद्यत हुए। तब गौतम जीवन्मृत गाय के निष्कृति के उपाय अनुसंधान के लिए विनायक के शरणापन्न हुए। गणेश ने तब उनसे कहा -''महादेव के

जटाजूट से तपस्या के बल से गंगा को मर्त्य में आनयन कर गाय को पवित्र जल से अभिषिक्त करने से ही उसकी निष्कृति होगी। महर्षि गौतम ने शेष पर्यन्त कठोर तपस्या करके गौतमी-गंगा का मर्त्यं में आगमन निश्चित किया।

(*ब्रह्मपुराण से संग्रहीत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

मृत्यु के अतीत

आसक्ति त्याग से संस्कार दूरीभूत हो जाते हैं, संस्कारों के दूरीभूत होने पर मन की भ्रान्ति अपगत हो जाती है। भ्रान्तिहीन मन में वैराग्य आता है, वैराग्य के फलस्वरूप मन पवित्र होता है। मन के पवित्र ना होने पर श्रद्धा या अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के प्रथम गुण की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा है मन की स्वच्छता; श्रद्धायुक्त स्वच्छ पवित्र मन में चैतन्य का आलोक प्रतिफलित होता है। तब साधक या योगी इस चैतन्य समुद्र में मन को निमज्जित करने के लिए परम उत्साह से, तीव्र मन:शक्ति के प्रयोग के द्वारा जो प्रयास करता है उसे ही तपस्या कहते हैं। ऐसी तपस्या के फलस्वरूप आत्म-उपलब्धि और ब्रह्मज्ञान लाभ का पथ उन्मुक्त होता है। श्रद्धावान आसक्तिहीन मन के द्वारा श्रद्धा के साथ आरम्भ कर शेष पर्यन्त प्रज्ञा में पहुँचना ही है अध्यात्म साधना। दृढ़ विश्वास ही है श्रद्धा। सर्वप्रथम साधक विश्वास करता है एवं अनुभव करता है कि वे हैं। यह विश्वास ही होता है सत्य उपलब्धि का बीज। श्रद्धा का अर्थ 'श्रत् धीयते अस्मिन्', अर्थात् सत्य को निज के मध्य धारण करना। परमात्मा एकमेवाद्वितीयम् सत् सत्ता। अतएव सत्य में प्रतिष्ठित ना होने पर उसे खोजा नहीं जा सकता। इसीलिए इस पथ पर विश्वास या श्रद्धा का महत्त्व अपरिसीम है। बद्ध मन की सीमा को पारकर, स्वार्थपरता से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता के साधन द्वारा संकीर्ण मनोराज्य की सीमा अतिक्रम करने पर ही महासत्य स्वरूप अनन्त ज्योति: समुद्र का आभास पाना सम्भव होता है। आत्मा इन्द्रियातीत, मनातीत, बुद्धि के अतीत और ध्यानातीत होती है। योग-समाधि में मनोलय अवस्था में जिस सीमाहीन अनन्त आत्मा या चैतन्य समुद्र का संधान मिलता है वही निर्वाण राज्य है। इस निर्वाण राज्य में चंचल मन के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसीलिए उपनिषद के निर्देश, 'शान्त-उपासीत' शान्त होना पड़ेगा। शान्त होने के दो पथ है। दोनों ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रथमत: आसक्तिहीन, सत्चरित और श्रद्धायुक्त होना पड़ेगा। द्वितीयत: प्राण के साथ मन चूँकि ओतप्रोत भाव से सम्पर्कयुक्त है। इसीलिए प्राण की गति को नियंत्रण कर मन को संयत और शान्त करना पड़ेगा।

यह पथ एक शृंखला में बंधा हुआ है शृंखला भंग कर कभी महाशून्यता का अनुभव नहीं हो सकता। महाशून्यता परमात्मा के द्वारा पूर्ण होती है। पूर्णता लाभ का उद्देश्य योग साधना और ध्यान के द्वारा शून्यता के गभीर में प्रवेश करना है। प्रवेश करने पर ध्याता और ध्येय अर्थात् ध्यानी-व्यक्ति एवं ध्यान के अवलम्बन या विषय उभय ही विलुप्त हो जाते हैं। तब कोई सम्वित् नहीं रहता। अपनी देह, स्थान, काल यहाँ तक कि समस्त जगत् का अस्तित्व भी नहीं रहता। किन्तु मैं 'आत्मा' इस प्रकार शुद्ध अस्तित्व (Pure Existence) अर्थात् सिर्फ आत्मसत्ता का बोध जाग्रत रहता है। इस प्रकार की शान्त, समाहित अवस्था ही होती है समाधि। गभीर निद्रा या सुषुप्ति अवस्था में नित्य इसी प्रकार घटता है, किन्तु अज्ञानवशत: निद्रित व्यक्ति को आत्मसत्ता का बोध नहीं होता। इस सुषुप्ति अवस्था को लक्ष्य करके ही ऋषिगण जाग्रत रहते हुए अभ्यास के द्वारा चित्तवृत्ति निरोधरूप ध्यान के पथ पर तुरीय अवस्था में समाधिस्थ होकर सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति की उपलब्धि करते हैं।

इसीलिए ऋषियों ने कहा है –

"शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा:
आए धामानि दिव्यानि तस्तू:।
वेदाहमेतां पुरुषं महान्तम्
आदित्यवर्णं तमस: परस्तात्।।"

हे मानव! इस विश्वजगत् से भी जो वृहत् हैं वही परब्रह्म हैं, प्रति शरीर में, सर्व वस्तुओं में निगूढ़ भाव से, वे इस जगत् में व्याप्त हैं, उन्हें जानने से अमरत्त्व लाभ किया जा

सकता है। ऋषि ने और भी कहा, ''मैंने जाना है अंधकार के पार उस आदित्यवर्ण महान पुरुष को। उन्हें जानने पर मृत्यु को भी अतिक्रम किया जा सकता है।''

–श्रीतापस बन्द्योपाध्याय

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ५४: 'ज्ञान' क्या है? परमब्रह्म और ज्ञान का सम्बंध क्या है?

उत्तर : 'ज्ञान' का अर्थ है निश्चयात्मक बोध से जानना अथवा विषय को प्रकृत सत्यरूप से सटीक जानना। गीता में कहा गया है, निष्काम कर्म के अन्तिम पर्याय में ज्ञान का

उन्मेष होता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित हुए हैं, वे 'सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म' की उपलब्धि करने में सक्षम हुए हैं। जिसका मन या चित्त सुख-दुःख, जय-पराजय, पाप-पुण्य, निन्दा-प्रशंसा इत्यादि द्वन्द्वभाव के ऊर्ध्व में अवस्थान करता हैं, जो सर्वत्र समदर्शी, समस्त भूतवर्ग को वे निज के मध्य प्रत्यक्ष अनुभव करते है एवं निज के अस्तित्व को जो सर्वभूतों के मध्य अनुभव करने में सक्षम होते हैं, जो आत्मज्योति के दर्शन से मुग्धचित्त और स्थितप्रज्ञ होते हैं, उस आत्म-उपलब्धि की महिमा से उनका अज्ञान सम्पूर्णरूपेण विनष्ट होकर 'ज्ञान' प्रकाशमान सूर्य के सदृश उस परमपुरुष या परमब्रह्म को उनकी सत्ता के वक्ष पर अन्तराकाश में पूर्णरूप से प्रकाशित करता है। ज्ञान ब्रह्म का सर्वोत्तम पवित्र प्रकाश है। ज्ञान बुद्धिसत्त्व का आलोक है। योग-मार्ग में समाधि पर्याय में सत्य ज्ञान का उन्मेष होता है। यथार्थ में आत्मा की ज्योति ही है 'ज्ञान'। ज्ञानमार्ग में ही योगी को परमागति की प्राप्ति होती है। ज्ञानपर्याय में होता है ब्रह्मसाक्षात्कार। जीवन्मुक्त अवस्थालब्ध योगी के निकट ज्ञान परम निर्विकार सत्य का संधान प्रदान करता है। ज्ञानी योगीगण निवृत्तिमूलक वेदधर्म का अवलम्बन करते हैं।

महाभारत पुराण में धृतराष्ट्र ने सनत्सुजात ऋषि से जिज्ञासा किया –''जो इन तीन वेदों ऋक्, साम, यजु से अवगत हैं, वे यदि पाप कर्म करते हैं, तब क्या वह पाप उनके बंधन की सृष्टि करेगा?'' इस पर तब ऋषि सनत्सुजात ने कहा –''ऋक्-साम-यजु के कर्ममार्ग कभी भी एक मायाबद्ध जीव को मुक्ति का पथ दिखा नहीं सकते। वैदिक कर्म की पवित्रता सिर्फ उसे प्रकृष्ट ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित मात्र करती है, जैसे कहा जाता है – ''ऋक्-साम-यजु की चर्चा से एक मनुष्य ब्रह्मलोक में (ब्राह्मणत्व में) विराज करता है। अर्थात्, जिस आचरण से देवता की पदवी प्राप्त होती है, उन देवताओं का अवस्थान वेदविद् ब्राह्मणों के मध्य होता है। परन्तु इस मूर्तामूर्त माया जगत् के बाहर और एक महत्तम तत्त्व है, उसके लिए तपस्या करनी होगी। उस तपस्या के पुण्य से समस्त पापराशि निर्मूल होकर बाद में ज्ञानोदय होगा। उस ज्ञान से ही आत्मस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश दर्शित होता है। ज्ञान के द्वारा ही एकमात्र उस ब्रह्मस्वरूप आत्मा को लब्ध किया जाता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई पथ नहीं है; अन्यथा पुनः पुनः सिर्फ इस मायिक जगत् में आना-जाना।'' यहाँ ऋषि सनत्सुजात ने मोक्षधर्म का सार बताया है ब्रह्म के पर्याय शब्द 'सत्य' को ज्ञान के दूसरे पर्याय शब्द के अनुसार उल्लेख किया गया है। ऋषि ने कहा - समग्र वेदों का ज्ञाता कोई नहीं है अर्थात् समग्र वेद कोई नहीं जानता। यदि ऐसा नहीं होता, तो सम्पूर्ण वेद को जानने वाला कोई तो होता किन्तु वास्तव में वैसा कोई नहीं है। प्रकृतपक्ष में जो कहते है –''मैं वेद जानता हूँ,'' वे वास्तव में जिसे जानना चाहिए उस 'वेद्य' या ज्ञातव्य वस्तु को नहीं जानते। जो सत्य पर या आत्मा में स्थित हैं, वे ही यथार्थ में 'वेद्य' या 'ज्ञातव्य' वस्तु को जानते हैं। इस क्षेत्र में 'सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म' महावाक्य के मध्य ज्ञान साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हो उठता है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(२५)

वन्देहहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं श्रीमद्गुरुम्।
नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितम्।।७८

सच्चिदानन्दं, भेदातीतं, नित्यं, पूर्णं, निराकारं, निर्गुणं, स्वात्मसंस्थितं, श्रीमद्गुरुम् अहं वन्दे।।७८

वे सत्स्वरूप हैं अर्थात् उनके निकट जाने से ही असत् जगत् का ज्ञान विनष्ट होकर एकमात्र वे ही सत्स्वरूप में हैं तथा अन्य कुछ नहीं है, ऐसा प्रतिपन्न होता है। वे चित्स्वरूप हैं अर्थात् उनके निकट जाने से ही यह उपलब्धि होती है कि, वे जीव मध्य विराजमान हैं इसीलिए जीव चैतन्ययुक्त होता है, एवं उनके अभाव में जीवदेह शव में परिणत होता है। वे आनन्द स्वरूप हैं अर्थात् वहाँ रहने से यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि उनके साथ आनन्द में हूँ एवं इन्द्रियों के वशवर्ती होकर दूर जाने से ही दु:खाभिभूत होता हूँ। वे भेदातीत हैं एवं वहाँ जाने से ही जीव अच्छे-बुरे के भेदज्ञान से रहित हो जाता है। वे श्रीयुक्त हैं, श्री अर्थ का तात्पर्य शोभा, सम्पद, बुद्धि एवं कीर्ति होता है। ये समस्त लक्षण उनमें हैं इसीलिए वे श्रीमान हैं। उनके सम्पर्क में आकर जीव यह समझ जाता है कि उसकी जागतिक कालिमा विनष्ट हो गयी है। एवं वे सूक्ष्म और स्वच्छभाव को प्राप्त हुए है। वे जीव के सम्पदस्वरूप है कारण वे जीव के एकमात्र सम्पदस्वरूप होकर जीव की सर्वदा रक्षा करते रहते हैं तथा अन्य जो कुछ भी जीव की सम्पत्ति है, जीव के देहजनित अभाव को दूर करने के लिए उसका प्रयोजन होता है, देह सदा अभावयुक्त रहती है, अतएव जीव उस समस्त अभाव को पूरण करने के लिए सम्पत्ति प्राप्ति की चेष्टा में संलग्न रहता है परन्तु उनके निकट जाने से देह भी नहीं रहती व किसी प्रकार का अभाव भी नहीं रहता, अतएव वे जीव के चिरसम्पत्ति स्वरूप हैं। वे बुद्धिस्वरूप हैं इसीलिए जीव उनसे विच्छिन्न होकर नष्टबुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है (गीता २य अ:, ६३ श्लोक देखो) वे कीर्ति स्वरूप है इसीलिए जीव उनके निकट जाकर यह उपलब्धि करता है कि उनसे उत्पन्न होकर जगत् के कार्य शेष कर वह उनमें ही निवृत्ति प्राप्त करता है, एवं कर्मफलजनित जन्म-मृत्यु के अधिकार से मुक्ति पाता है, यही कीर्ति है – "कीर्तियस्य स जीवति"। उनके निकट जाकर असत् के अस्तित्व का अवसान होकर एकमात्र सत्य ही स्थायी भाव से रहता है यह समझ में आया, अतएव वे ही नित्य है। वे सर्वव्यापी होकर सर्वत्र एवं प्रति घट में पूर्णरूप से एवं एक ही भाव से दृश्यमान होते हैं इसीलिए वे पूर्ण हैं (ईशोपनिषत् शान्तिपाठ देखो)। दूर से उन्हें साकार और रूपविशिष्ट देखा था परन्तु घनिष्ठ संबंध से उनका साकार-मूर्तिरूप भौतिकदृश्य सूक्ष्म में विलय को प्राप्त हुआ, उस दर्शन से मेरे भी जड़-आकार ने मुझे छोड़ा (मुक्त किया), इस क्षण मैं भी निराकार और वे भी निराकार। वे निर्गुण हैं इसीलिए जीव को उपलब्धि होती है, अच्छे-बुरे का विचार रहने से ही गुणों का परिचय मिलता है, परन्तु जहाँ सभी अच्छे है, वहाँ बुरा ना रहने के कारण, गुणनिर्देशक के अभाव हेतु वे निर्गुण, उसके साथ ही मैं भी गुणवस्तु (जड़देह) वर्ज्जित होकर निर्गुण हुआ हूँ। उन्हें स्वात्मसंस्थित देखा है – भिन्नवस्तु में संस्थित होकर मैं भिन्नवस्तु को आत्मीय कहकर मानता हूँ, इस क्षण देख रहा हूँ कि वे ही समस्त के आधारस्वरूप है, एवं उनके आधारस्वरूप कोई नहीं है, अतएव वे स्वयं ही अपने में स्थितिसम्पन्न हैं। इसीरूप श्रीमत् गुरु की मैं वन्दना करती हूँ, उसका सुफल क्या हुआ? – मैंने भी आत्मपद पर संस्थिति लाभ की। ७८

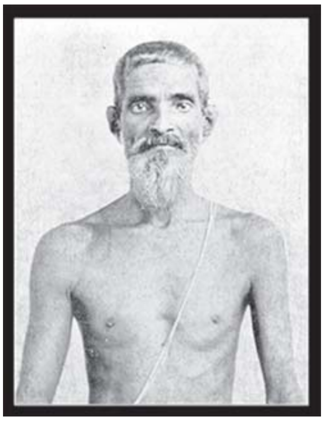

...क्रमश:

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(७)

श्रीश्रीमाँ के शब्दों में – भगवती श्रीराधा के विषय में – राधाष्टमी तिथि –इं. ६/९/२०१९

श्रीराधा मूला ह्लादिनी शक्ति हैं। इस ह्लादिनी शक्ति की सर्व आनन्दातिशायिनी वृत्ति भक्तों के चित्त मध्य हृदय में निक्षिप्त होकर भगवत्प्रीति रूप में भक्तों की सत्ता मध्य विराज करती है। श्रीराधा को श्रीकृष्ण प्रेम के प्रवाह का बीज या उत्पत्तिस्थल माना जाता है। पद्मपुराण में कार्तिक महात्म्य में शौनक-नारद संवाद से जाना जाता है कि – 'श्रीकृष्ण ने श्रीराधा को सर्वश्रेष्ठ प्रिया मानकर उन्हें श्रीवृन्दावन का आधिपत्य प्रदान किया था।' स्वयं आनन्द स्वरूप होकर भी श्रीभगवान ने जिस शक्ति के द्वारा स्वयं आनन्द आस्वादन किया था एवं भक्तों को भी आनन्द का आस्वादन कराया था, उस शक्ति को ही ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। उस ह्लादिनी शक्ति का परमसार रूप ही है 'श्रीराधा'। चैतन्य चरितामृत में वर्णित है –'ह्लादिनी का सार हैं प्रेम'; प्रेम का सार हैं 'भाव'। भाव की पराकाष्ठा का नाम है 'महाभाव' और उस महाभाव के स्वरूप में हैं 'श्रीराधा ठाकुरानी सर्वगुणों की खान कृष्णकान्त शिरोमणि।'

भगवती 'राधा' हैं योगमाया और भगवती 'दुर्गा' हैं महामाया। 'राधा' निवृत्तिमार्ग पर अवस्थान करती है, और गतिपथ पर 'धारा' रूप में महामाया स्वरूपिणी ललिता-देवी-दुर्गा साधकगणों की मोक्ष दायिनी है। देवी राधा मंजुस्वभावा, मधुर स्निग्ध स्वभावयुक्त है। श्रीकृष्ण के प्रति, सखी मंजरीयों के प्रति और अखिल विश्व के जीवों के प्रति इसी मंजुस्वभाव की अभिव्यक्ति प्रकाशित होती है। भगवान श्रीकृष्ण को जो जिस भाव से भजता है, श्रीकृष्ण उसपर तदनुरूप ही कृपा करते है। लेकिन मंजुस्वभावा श्रीराधा सम्पूर्ण विश्व के जीवों के प्रति बिना विचार किए ही कृपा करती है; श्रीराधा जीवों के प्रति अविचार से प्रेमदान कर देती हैं, यही उनके दिव्य स्वभाव की विशिष्टता है। श्रीराधा है प्रेम की साक्षात् अधिष्ठात्री देवी। श्रीराधा नाम श्रीकृष्ण का आकर्षणी महामन्त्र है। कारण, श्रीराधा के मध्य जो आनन्द-धारा प्रवाहित होती है वह सहज एवं अद्भूत हैं। वह प्रेमानन्द-धारा ऐश्वर्य-ज्ञानगंधशून्य सिर्फ माधुर्यमय है। इसीलिए वह सहज एवं स्वाभाविक है। यह अद्भुत और आश्चर्यमय कारण है जो चमत्कार से पूर्ण है। श्रीकृष्ण के अन्तर में सुख का संचार करना ही महाभाव का कार्य है। सभी ब्रजगोपीगणों में महाभाव की वृत्ति प्रचुरता में विद्यमान रहने पर भी श्रीराधा महाभाव का सारांश उद्रेकमयी। श्रुति में 'आनन्दं ब्रह्म' 'आनन्दममृतं यद्विभाति' 'आनन्द ब्रह्मणों रूपं' इत्यादि ब्रह्म की जो आनन्दरूपता निर्णीत हुई है, श्रीकृष्ण ही उस आनन्द के कन्द या मूल है। कारण वे ही स्वयं भगवान है। उसी प्रकार श्रीराधा आनन्दकन्द श्रीभगवान की परम अद्भूत सौम्या लक्ष्मी है। श्रीराधा हैं पूर्ण श्रीकृष्ण अनुराग रस की दिव्यमूर्ति। 'राधा' सर्वगुह्यतम दिव्य-उपलब्धि का विषय महाभाव रस सार हैं। इसीलिए 'राधा' नाम जप सिद्ध योगी श्रीकृष्ण का दर्शन सहज ही प्राप्त करते हैं।

श्रीराधा अनन्तगुणमयी, श्रीकृष्ण अनन्त गुणमय। दोनों एक दूसरे के सम्पूरक और समरस्यता प्राप्त परमब्रह्म स्वरूप सत्ता। परमब्रह्म सत्ता के गुण कहने से निर्गुण में सगुण, सगुण में निर्गुण सम्मिलित रहने की अवस्था में स्वभाव का अनन्त स्फुरण ज्ञात होता है। पुराणों एवं शास्त्रों में उल्लिखित है, राधाकृष्ण के भक्तगण 'रा' शब्द के उच्चारण मात्र से ही मुक्तिपद को प्राप्त करते हैं एवं सिर्फ अन्तयवर्ण 'धा' शब्द के उच्चारण करने से हरि पद की ओर धावमान होते हैं। श्रीकृष्ण का दूसरा नाम अनंगमोहन है। उन अनंग मोहन की इच्छामात्र से ही वामांग से रासेश्वरी श्रीराधा उत्पन्न हुई। अन्यान्य देवगणों की स्त्रियाँ उनके ही अंश से उत्पन्न हुई हैं।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

भगवान पर निर्भर रहकर चलते रहो, वे ही विपदा में सहायक हैं। शुभाशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त कर उद्धार करते हैं। संसार के जीव मान-अपमान के बोध से ही बद्ध रहते हैं, समय के साथ साथ सब सहन करना ही कर्तव्य है। धैर्य से ही सब अभावों का नाश होता है। स्रष्टा ने जो व्यवस्था रची हैं वे स्वयं ही उसका नियमन भी करेंगे। **–श्रीश्रीरामठाकुर**

आश्रम समाचार

२९ सितम्बर - ४ अक्टूबर – इसबार आश्रम की २८ वीं नवरात्रि व्यापी दुर्गापूजा अनुष्ठित हुई। पंचमी के दिन सुबह से श्रीश्रीमाँ के कर-कमलों से पाँच सौ से अधिक ग्रामवासियों को वस्त्र वितरण किए गए। इस दिन संध्या में पण्डित श्रीगिरिधारी नायक के 'उड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों द्वारा एक मनोरम नृत्यानुष्ठान प्रस्तुत किया गया।

हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या का भी विमोचन हुआ। सप्तमी के पावन संध्या पर श्रीश्रीमाँ के साथ गुरुभ्राता और भगिनियों ने श्रुतिमधुर संगीत का परिवेशन किया। इसी दिन नृत्य भी प्रदर्शित किए शिशु कलाकारों ने। महाष्टमी तिथि के अवसर पर श्रीश्रीश्यामाचरण लाहिड़ीबाबा के तिरोधान तिथि के उपलक्ष्य पर भण्डारा का आयोजन किया गया। नवमी के दिन समागत अनेक भक्तों के मध्य श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद वितरण किया गया। इसबार पूजा के विभिन्न दिनों में उपस्थित थे रामकृष्णमिशन से स्वामी पूर्णब्रह्मानंदजी एवं स्वामी भेदातीतानंदजी, भारतसेवाश्रम से स्वामी एकात्मानंदजी एवं परमहंस योगानंद की धारा अनुयायी स्वामी चेतनानंदजी।

१-१९ अक्टूबर – पुष्कर निवासी श्रीश्रीटाटबाबा अखंड महापीठ आश्रम में अतिवाहित किये। दुर्गापूजा में उनका सान्निध्य सबको निर्मल आनंद प्रदान किया।

१३ अक्टूबर – श्रीश्रीकोजागरी पूर्णिमा में श्रीयज्ञनारायणदा के पौरोहित्य में श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की आराधना और यज्ञ बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुए।

२० अक्टूबर – इस दिन सुबह श्रीश्रीमाँ ने अगणित दरिद्र ग्रामवासियों के मध्य वस्त्रादि वितरित किए। वस्त्र के साथ प्रत्येक को मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किये गये।

२७ अक्टूबर – हमेशा की तरह दीपावली के पर्व पर आश्रम में मनोहर रंगोलियों और मोम-बत्तियों की आभा एक अलग सा सौन्दर्य प्रदान कर रही थी। अमानिशा की मध्यरात्रि में श्रीश्रीमाँ ने अपने ही आश्रम में प्रतिष्ठित देवी ताराकालिका की पूजा की।

५ नवम्बर – इस दिन जगद्धात्री पूजा के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीअन्नपूर्णा मंदिर में भोग निवेदित हुआ।

१० नवम्बर – अखण्ड महापीठ माता सर्वाणी ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा अनुष्ठित हुई।

१२ नवम्बर – रासपूर्णिमा के दिन श्रीश्रीराधामाधव को दोपहर में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण हुआ। इस पुनीत संध्या पर श्रीश्रीमाँ ने कई अपूर्व भजन प्रस्तुत किए।

१४-१५ नवम्बर – श्रीश्रीमाँ कुछ भक्तों के साथ राजस्थान के रामदेवरा में श्रीश्रीरामदेवरा बाबा के मंदिर दर्शन के लिए गयी थी।

१ दिसम्बर – इस दिन प्रात:काल श्रीश्रीमाँ ने ग्रामवासियों को कम्बल तथा शीतवस्त्र साथ में मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किए।

४-५ दिसम्बर – ४ दिसम्बर अखण्ड महापीठ के भक्तनिवास और अन्नपूर्णाक्षेत्र में मन्दिर प्रतिष्ठा दिवस पर प्रात:काल की मंगल बेला में पूजा और प्रसाद वितरण किया गया। श्रीश्रीमाँ ने बच्चों को निज-करों से प्रसाद वितरण किया। संध्या में श्रीमती लावणी लाहिड़ी ने अपूर्व गीतों का परिवेशन किया। ५ दिसम्बर में प्रात:काल 'श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ' की पूजा-अर्चना और भोगप्रसाद वितरण संपन्न हुआ।

८-१८ दिसम्बर – कुछेक भक्तसह श्रीश्रीमाँ ने वाराणसी के आश्रम में निवास किया। इस समय श्रीश्रीमाँ अन्यान्य महात्माओं के आश्रम में भी पधारी थी - गाजीपुर में पावहारी बाबा के आश्रम एवं देवराहा बाबा के आश्रम में श्रीश्रीहंसबाबा व श्रीश्रीनारायण बाबा से साक्षात् किए। वापसी के पथ पर बोधगया में भी गयी थी।

२५ दिसम्बर – इस दिन संध्या में आध्यात्मिक सभा के ३३ वें पर्व पर प्रश्णोपनिषद् पर गुरुभ्राता डा. वरुण दत्त ने एक अपूर्व व्याख्यान प्रस्तुत किया।

२९ दिसम्बर - इस दिन सुबह सत्संग में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग एवं आध्यात्मिक विज्ञान के विषय पर प्रवचन दिया।

३० दिसम्बर–२ जनवरी – कुछेक भक्तसह श्रीश्रीमाँ ने देवघर तीर्थ परिभ्रमण में गये थे।

५ जनवरी – इस संध्या में होटर आश्रम का शिक्षार्थीओं ने एक अपूर्व सांस्कृतिक अनुष्ठान का निवेदन किया।

Bhagwan Parashurama - Immortal Avatar

Sree Sree Maa Sharbani

Avatars are many, from part to whole,
Uniquely manifesting the supreme soul;
Bhagwan Parashurama – aveshavatar,
Divine power emanates from his aadhar.

The Garga Samhita has categorized avatars (incarnations of the supreme divine) into six groups. The first is the angshansha (divine sub-part) group with rishis like Marichi and others. Those who have attained Brahmarshi-Godhood are considered angsha-avatars (or partial incarnations). Sage Kapila, Kurma and others are kala-avatars (or divine-quality-expressed forms) and Parashurama is an aveshavatar (divinely endowed manifestation in whom the supreme force descends). Nrisingha or Narasimha, Rama (son of Dasaratha), Nara-Narayana et al are purna (or whole) avatars while Sri Krishna is the paripurnatama (complete in all respects) avatar form. Whatever be the category, the Supreme Being's full power expresses through every incarnated form. Highly qualified sages of Brahmarshi and Maharshi level, on their path of divine yogic union, descend on the earth in avatar forms as per will of the supreme. Fully realized great souls are able to perceive this through their truth-illuminated vision. Bhagwan Parashurama is one such unique avatar personality.

Bhrigu-son Richik seeks
Satyavati as bride,
A thousand rare horses
he has to provide;
An ancestral tradition
her father Gadhi says,
With Varuna's help,
this dowry Richik pays.

King Kushanav had a son named Kushik. Kushik performed penance and received as blessings a son called Gadhi, who bore the qualities of Indra, the king of the Gods. Gadhi was blessed with a beautiful daughter named Satyavati. On the other side, when Maharshi Bhrigu's son Richik proposed to marry Satyavati, Gadhi responded by saying, "O Richik, you are highly endowed with spiritual prowess. In our family, there is an ancestral tradition of receiving as gift one thousand horses, each shining as the moon, having light dark complexioned exterior but blood red interior, with one black ear. Though I wish to give my daughter to you, I am in a fix regarding breaking this tradition. Yet I cannot ask you for it. Hearing such a condition, Richik went to the Varuna, lord of the waters, who provided the same and thereafter Richik married Satyavati.

Bhagwan Parashurama

Satyavati gets a boon
from Richik's father,
She asks for sons
for self and her mother;
Concoctions are switched
by quirk of fate,
A warrior-sage is born
a generation late.

Once Sage Bhrigu visited the ashram (hermitage) of Richik. He was reverentially received by his son and daughter-in-law. Bhrigu was pleased with their service and asked Satyavati to seek a boon. Satyavati requested for a son for herself and one more

for her mother. Rishi Bhrigu prepared a special concoction for each of them and advised as follows: - "You and your mother drink these embracing audumbar (fig) and ashvattha (wood apple) trees, respectively." However, mother and daughter by mistake exchanged the process. Noticing this through his yogic power, Maharshi Bhrigu told them, "Since you have done the opposite of what I asked, you (wife of a Brahmin) will give birth to son who has the character of a Kshatriya while your mother (a Kshatriya queen) will beget a son who has the qualities of a Brahmin." Hearing this, Satyavati pleaded, "Please do not let my son be this natured. Let it be for my grandson." "So be it!" exclaimed Bhrigu and departed. Satyavati gave birth to a son who was named Jamadagni. Jamadagni studied the scriptures and excelled many a sages in his attainments. He then requested for the hand of Renuka, daughter of King Prasenjit, as his wife. After marriage, Renuka and Jamadagni had five sons, namely Rumnvan, Sushen, Vasu, Vishwavasu and Parashurama.

Parashu-Rama – holy axe of the soul,
Takes every being towards the goal;
Powered by knowledge-fire of the atma,
Sanat Kumara descends as Parashurama.

'Parashu' is the weapon of dharma-yagna (righteous sacrifice) and 'Rama' is Atma-Narayana (divine-soul-being). Atma-yagna (ritual of purification by the fire-power of the soul) is the real dharma-yagna. It destroys all impurities. The axe is used to gather fire-wood for the yagna. It is therefore a very holy instrument. The fire (chid-agni) of the soul-consciousness (atma-chaitanya) is wisdom-fire (gyan-agni) through which the light of pristine eternal truth emanates. Thus 'Parashurama' symbolizes the fire-power of knowledge as described in the scriptures. According to the Bhagwata Purana, Bhagwan Parashurama is the sixteenth avatar of Lord Narayana. Through the light of self-knowledge, one can see Bhagwan Parashurama's avatarhood as the attainment of 'Jagannatha' stage of the illustrious sage Bhagwan Sanat Kumara, depicting the power of the 'Lord Balarama' form therein – a divine expression of a sage in his journey towards manifestation of the fundamentals of universal Godhood. Thus he is an avesha-avatar or one endowed with the force of divine power.

Renuka falls prey to a momentary sway,
On father's order, he takes her life away;
A pleased Sadguru offers many a boon,
His lost mother Rama gets back very soon.

Once, while the sons of Maharshi Jamadagni were away in the forest to collect fruits and other items, his wife Renuka went to take a bath in the river. While returning from her bath along the river bank, Renuka came across King Chitrarath playfully engaged in water games with his wives. On seeing the extremely handsome king, Renuka, all of a sudden, became deeply attracted to him. She returned home engrossed in his thought. Gauging her mind, Maharshi Jamadagni was furious and began to severely castigate her. Amidst this situation their four sons (other than Parashurama) returned from the woods. Jamadagni instructed them to kill their mother, but due to their fond emotional attachment to her, each of the four declined. Maharshi cursed them for disobeying his order. Thereafter when the youngest son returned, his father repeated his command to Parashurama, who immediately lifted his axe and beheaded his mother. Now Jamadagni's anger subsided. Pleased with his son, he said, "Rama, you have performed an extremely difficult task. Therefore ask for as many boons as you want." The son then prayed to his Sadguru (Divine Master) father to bring his mother back to life, ensure that

she does not remember this incident, wiping away of his own sin of killing his mother and lifting of the curse on his brothers. He also requested that he remains undefeated in contest and has a long life himself. His contented father blessed him with every one of them.

Having resolute faith,
freedom from illusion,
Gives every impossible
a wonder solution.

Avatar souls display unique characteristics. Due to the ingrained divine power of spiritual accomplishments of many past lives, Parashurama was born free of maya (worldly illusion). That is why his resolute faith in the decision of his Sadguru father made him perform the instructed task unwaveringly. One who is firm on the seat of faith in the supreme, always remains connected with Sadguru, the divinely ordained master. Satisfying the Sadguru can result in blessings that make the impossible become possible. Thus we see his mother Renuka get her life back and his brothers get a fresh opportunity to continue their yogic pursuits free from the trappings of a deadly parental curse.

For penance,
to the Himalayas he ascends,
On return,
with him Brahmaputra descends.

Thereafter, in order to cleanse himself of the sin of slaying his mother, on the advice of his father, Parashurama placed himself in a remote location between Mount Kailasa in the north and Mount Gandhamadhan in the south, bathed in Lake Brahmaputra and began arduous tapasya (spiritual penance). After realizing the auspiciousness of the waters of the lake though regular bath and consumption, he then used his axe to chart the path of river Brahmaputra to the plains, for the benefit of the world and its people.

The divine kamadhenu
is stolen by a king,
Parashurama retrieves it
with his axe-sting;
When Jamadagni is killed
in an act of revenge,
The Kshatriya race
is destroyed with vengeance.

Once the mighty Haihaya king Kartavirya-Arjuna and his team came to Maharshi Jamadagni's ashram (hermitage) during the course of their hunting games in the forest. The sage then gave the king and his whole entourage a fabulous reception by refreshing them with the offerings of his kamadhenu (wish-fulfilling cow). The king, craving for this magical cow, took away (by force) the calf of the milch cow for sacred oblations (homadhenu). He also cut off the trees of the ashram destroying its serene beauty, cruelly tortured Jamadagni and returned to his capital Mahishmati. Parashurama was away when this disaster happened. On returning and hearing everything from his father, he became enraged. He then challenged Kartavirya-Arjuna in battle, defeated and dismembered the erstwhile undefeated haughty monarch. The sons of the king, in order to take revenge, entered the hermitage of Jamadagni when his sons were away and fiercely beat the saintly sage engaged in tapasya to death. Parashurama, on getting the details and physically examining the state of affairs, first completed the last rites of his father. He then went to Mahishmati and decimated all the sons of Kartavirya, following it up by destroying all his Kshatriya allies. In this manner he wiped off the Kshatriya race twenty-one times. Afterwards to expiate himself, he performed offerings to ancestors and divine entities in five pilgrimages. Finally he performed the Ashwamedha Yagna (Victorious Horse Sacrifice) and on

successful completion offered his whole conquest of the earth to Sage Kashyapa. On advice of the august sage, Parashurama went westwards to live on the shores of the sea.

The pious he protects and defends,
Evil and unjust meet a deadly ends.

The role of Bhagwan Parashurama in fighting injustice, defeating evil and safeguarding the pious is exemplified by the above aspect of his life's leela (play). Almost all sages of the Bhrigu clan had mastery over weapons and the art of warfare. In the Ramayana we find that the Lord Sri Hari-sanctified bow used by Parashurama to destroy twenty-one generations of Kshatriyas was inherited by him from his father. He, like his father, was considered the greatest archer of his times. As mentioned earlier he is the sixteenth avatar of Bhagwan Sri Narayan according to the Bhagawata. In this context, the illustrious poet Sri Jayadeva Goswami in his famous Dasavatara Strotra wrote:

kshatriya-rudhira-maye
jagad-apagata-papam
snapayasi payasi
samita-bhava-tapam
kesava dhrita-bhrigupati-rupa
jaya jagadisa hare

[*O Kesava, assuming the form of Parashurama (of Bhrigu descent), by bathing the earth in the rivers of vile Kshatriya blood, you have cleansed the world of demoniac sins and cooled the planet from the heated burden of evil. May you be ever victorious O Lord of the world*]

He makes a pilgrimage to Mount Kailasa,
And comes to blows with Lord Ganesha;
An unforgettable divine play takes place,
He attains divinity with Ekadanta's grace.

After completing his designated task of eliminating the Kshatriyas, Bhagwan Parashurama made a journey to Mount Kailasa to meet and pay his respects to his Shiva-Guru, Lord Shiva, Mata Shivani and their Narayana-like children Kartikeya and Ganesha. As he was entering the abode of Lord Shiva, Ganesha was at the gate guarding the entrance. Since Lord Shiva was resting, Ganesha did not allow Parashurama to enter at that moment. An angry rebuffed Parashurama struck Ganesha with his axe, due to which one tooth of Ganesha broke. This fight between Parashurama and Krishna-like Ganesha was an enactment of a divine play destined by God through which Parambrahman-alike Ganesha received the name 'Ekadanta'. 'Eka' denotes 'principal' or 'main' and 'Danta' symbolizes 'striking force' or 'bal' (meaning power / strength). One who has acquired the highest powers of yoga-attainment (siddhi) is given the title 'Ekadanta'. During his duel with Parashurama, knowing him to be a favourite disciple of this father (Lord Shiva), instead of striking him, Ganesha used his stupefying powers to take Parashurama through a journey of the eternal divine worlds of Golaka and Vaikuntha and even got him to receive a glimpse of the pristine-pure form of the supreme lord, Sri Krishna. By this, Parashurama's past karmas (deeds) and their consequences were wiped off. Lord Mahadeva-gifted Parashu (Axe) was the source of Parashurama's superlative powers that kept him unvanquished throughout. Through this leela or divine play we get a glimpse of the real forms of both these divine personalities. The Brahma-Vaivarta Purana has a detailed description of it.

In Treta when Sri Rama descends,
Parashurama's public leela ends;
Behind the scenes he still remains,
As Guru of Gurus, many he trains.

In Treta-Yuga, during the Swayamvar Sabha (Husband Selection Ceremony) of Sita, on hearing of Sri Rama breaking his Shiva-gifted bow in King Janaka's palace,

Parashurama came fuming in anger and invited Sri Rama in a one-to-one contest. He first gave Sri Rama his own bow and asked him to string it. Sri Rama effortlessly tied it and fixing an arrow to the empowered bow asked, "Where shall I send the arrow?" He then used the arrow to disarm Parashurama of all his penance-acquired powers as well as those won over in worldly conquests. Through this, the very subtle ego of Parashurama was crushed leaving the underlying pristine purity of the soul's self to bloom without a veil. As his fury abated, Bhagwan Parashurama was able to visualize the true form of Sri Rama through his wisdom-illuminated vision. He then receded and moved on to the Himalayas re-embarking on his penance and spiritual endeavours. Through the grace of Lord Mahadeva (Shiva), Bhagwan Parashurama remains immortal. In the Mahabharata, he is seen as the Supreme Divine Guru. He was the weaponry Guru of Dronacharya, who in turn was the teacher of the Pandavas and Kauravas. Ever the willing donor, Bhagwan Parashurama taught many including Dronacharya, who received several divine weapons and the knowledge of their usage from the great immortal.

Kalki he guides to defeat
the vile and evil,
To restore Dharma
from hands of the devil.

Subsequently it is seen that Bhagwan Kalki studied the Vedas under the tutelage of Sri Parashurama. When Kalki asked what he shall give in return for the teaching (as Guru-dakshina), Parashurama replied, "Go to the island of Singhal (Sri Lanka), accept Vishnupriya as your wife and establish Sanatan Dharma (Rule of the Ancient Eternal Faith). March ahead victoriously; defeat the vile rulers who have destroyed dharma in Kali Yuga and the vice-ridden Buddhist preachers who have brought ill repute to their religion. Thereafter you shall install the righteous Devapi and Maru (son of Srighra of the Ikshvaku lineage) as monarchs." Parashurama thus instructed a Kalki Avatar on the establishment of Dharma Rajya (Rule of Righteousness).

In mysterious Gyangunj
lives on Parashuram,
As the Supreme Master
Guru Sri Bhriguram.

In the deep recesses of the Himalayas, in the sacred groves of the ever mysterious Gyangunj, still reins the great master, the immortal avatar soul Bhagwan Parashurama. There he is revered as the Supreme Acharya,'Bhriguram Swami', well-known to many as the Divine Yoga-Guru of Sri Vishuddhananda Paramhansa.

To this great omnipresent personality, we bow in reverence a million times.

Through time immemorial this great soul,
Has shown us the light, path and goal;
Taking many key roles, Sage Sanat Kumar,
Became Parashurama, Buddha, Mahavatar;

Holding the fort of Spiritual Knowledge,
As the World Teacher, age after age;
Lord Badrinarayana, Kapila to Patanjali,
Covering Satya-Treta-Dwapara-Kali;

In every heart-mind his wisdom chimes,
His causeless grace strikes million times;
So that every sadhak's every breath,
Seeks the divine from birth to death.

How fortunate are we to be in his fold,
He, whose glory cannot be fully told;
We pray to God to get a sacred seat,
At the base of his blessed lotus feet.

–Translated by her blessed child,
Prof. Partha Pratim Chakrabarti

Unmesh

[Soul's Blooming - Part VII]

Sree Sree Maa Sharbani

Maghi Purnima (Dated: 09/02/09)

A disciple asked Sree Sree Maa, "Maa, all sadhus and savants comment that unless you become devoid of desires (*nishkama*), one cannot attain God. How is it possible for us to become desire-free?"

Sree Sree Maa: "Son, you need not become fully *nishkama* (free of desires). Live with your positive desires. Carry out good works with uplifted desires of service - perform Kriya daily as given by the Sadguru. Worship God. Dwell upon the existence of God. Love each other. Keep a strict vigil on your innate demoniac instincts so that they do not engulf you and drive you towards wrong actions. If one remains in association with true sadhus and savants, performs spiritual practices, one can achieve righteousness (*dharma),* prosperity (*artha)* and aesthetic pleasure (*kaam)* amongst the four objects of human pursuit. '*Moksha*' (liberation) remains a distant goal. If one can overcome worldly pleasures, the pathway to '*Moksha*' begins to unfold. Accumulation of good deeds ultimately leads to attainment of worldly peace and happiness. How will this world move forward if people do not have desires? It is for you all that the flow of this world still continues.

Plagued with pain and suffering, when human beings lament in distraught and ardently keep praying to God for relief, then at times, God comes in the form of a devotee to save them. God in the form of this true devotee is the 'Sadguru'. To permanently attain the kingdom of God and reside there, one has to fervently proceed in this spiritual pursuit. Through the performance of severe austerities (*tapasya*) enriched by the power of devotional love (*bhakti*) all worldly desires that this universe has to offer gradually diminishes and peels off completely. It is only then that the aspirant, with divine grace, steps into the stage of 'Brahma-Nirvana' (immersion in Brahman) and is chosen to become a permanent resident in God's kingdom of glory and beatified elegance.

"*Brahma-Nirvana*"- is the ultimate stage of ascended existence, the other name of "*Kaivalya" (*existence in Singular Oneness*).* Mahatmas of *nityaloka* (eternal divine world) are akin to God. It is only they, who can impart the state of "*Kaivalya*". Nothing is impossible for God. Through Divine grace of the Lord, even birds and animals are sometimes able to attain the state of '*Kaivalya*'. I have seen such in the '*Nitya Bhumi' (*realms of the eternal*).* Once, Prabhu Jagatbandhu Sundar went off to sleep reclining against a cow. The next day the cow passed away. Prabhu remained unperturbed. He disclosed to his associates that the cow had attained '*Nityadham*' (eternal abode). Through my own realization I can confide with you that in '*Nityaloka*' I have seen many cows adorned with ornaments and jewelry; each one of them is capable of communicating the subject of Absolute Knowledge through thought waves. In many cases, when the Lord

descends on the earth to unfurl the divine play, all those beings, manifest in human forms and come down on this earth as devotees where they also carry out spiritual practices in the divine company of the Lord. Subsequently those individual selves attain everlasting God-like human forms and remain eternally submerged in an immutable state of divinity, perpetually engaged in the service of the Lord.

It is my perception that, according to the laws of creation, common living entities like animals and birds remain surrendered to nature in a desire-free state and therefore can more easily reach the eternal world in the auspicious presence of God and His august company. In human beings, excitement of instincts generates a variety of aspirational desires, thereby delaying the process of achieving the divine abode. This probably occurs because the human thought process lacks the innate straightforward simplicity which is typically present in ordinary animals.

Through severe penance (*tapasya*) a yogi aspirant should first affix himself firmly to the seat of '*Sthita-prajna*' or unwavering wisdom. Once he is able to plant himself on that seat, the aspirant can carry on his spiritual practices of dispassionate devotion (*nishkama bhakti-yoga*). The yogi aspirant obtains the path of devotion through the light of his innate wisdom-fire (*jnan-agni*). This fire of wisdom is the conscious-fire (*chit-agni*) of self-awareness (*astitva-bodh*) within an individual soul-self (atma satta). When this wisdom-filled fire of soul-consciousness illuminates the yogi's heart, then all *samskaras* or past instinct-impressions within the yogi are burnt into ash. When all the *samskaras* are enflamed into ashes, only then within the yogi's inner sky of consciousness arises the radiant sun of wisdom. In that effulgent light of the Wisdom-Sun sprouts Dhruva *Jnana,* or True Eternal Knowledge, within the yogi's heart and if the yogi is able to remain unwavered in this state, he reaches *yogyuktavastha* or a unified yogic state and attains the stage of being a *Sthita-prajna.*

The spiritual path of *Brahmavidya* in the form of Kriya Yoga, paved by the revered Sri Sri Shyamacharan Lahiri Baba involves several spiritual practice techniques of transcendental or *Paravastha* Kriya from its third stage onwards including types like "*Thokkar*" and "*Granthi unfurling*" Kriyas, which are part of *Laya-Yoga*. When these are practiced flawlessly, the *prana* or life-force within the heart reaches equilibrium and confluences with *Parasamvita* or supra-consciousness and in this state, yogis establish themselves on *Dharana* (or concept-realization of Brahman) and then delving into deep meditative state (*Dhyana*) propel their inner-consciousness successfully towards the Supreme Infinite. It implies that the Yogi *sadhaka* at that point of time moves from finite to infinite consciousness and attains *yuktavastha* or a unified yogic state. At that stage, the Yogi stays in a kind of *Samadhi* or super-conscious state of '*Kevalam*' (One-in-Union existence).Then, the flow of *prana* or life force within the individual-self ceases leaving behind the sole vibration of Supra-consciousness or *Parasamvita*. Thereupon the feelings that emerge within the being are all *Dhruva* or eternal. This is the matured state of '*Sthita-prajna*'.

Within the realm of Maya, general feelings of devotion may misdirect an aspirant. Wisdom-permeated devotion leads to the true path of '*Bhakti-Yoga*'."

...to be continued

—Translated into English by
Dr Durgesh Chakrabarty,
Her Blessed Child

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

The glorious achievement of 'Dada', the great yogi:

One of Baba's disciples, who received kriya initiation, used to call Sri Sri Baba (Lahiri Baba) as 'Dada'. I narrate below a few incidents under the above heading, as described by that sincere disciple –

(72)

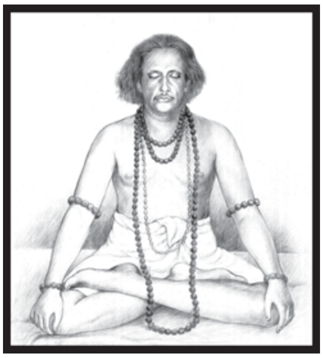

Once, I was having intense chest pain for about seven days for which I did not seek any physician's help or take any medicine. The pain was on the increase everyday. One day, I was compelled to send the elder son of my younger uncle to Dada. I told him to tell Dada about my miserable condition and also indicated the nickname by which Dada used to call me. My brother returned and told me that he had expressed every detail to my Gurudev. He said, "It is ok." Next day, I was totally fit and as I went to Dada, he said to Nabada, "I was testing how much he could withstand."

(73)

I heard this incident from Dada – He used to go to Shibpur burning ghat at night for his spiritual practice. It was winter then, very cold, raining intermittently. Dada was wearing a woolen quilt, seeing which his mother asked him, "Are you not going to the burning ghat today?" When he replied that the extreme cold and rain was the reason of his not going to the burning ghat, Matarani told Dada - "Had you gone today, you could have obtained the darshan of the Divine Mother." At last, Dada, on mother's advice, walked quickly to the burning ghat with the hope of Divine Mother's darshan. It was late night then. Dada did not disclose anything else. The next episode was confined to Dada only and unknown to us. Mother's auspicious wishes for her son and the resultant instructions always bestows good. The mother who has a truly spiritual mind, never fails in her auspicious wishes. Sri Sri Baba's mother was a sincere kriya disciple of Sri Sri Yukteswar Giri Maharaj and was dedicated to her Guru. Sri Sri Baba never used to disregard her mother's order.

(74)

Durgapuja was going on in Dada's house, probably it was the morning of Ashtami or Navami. Dada called one disciple and asked him whether he practices kriya as his spiritual discipline. The disciple replied, "I am not regular, but have decided to perform regularly after the puja." Dada said, "It is not bad in knowing the spiritual line at mere five rupees, isn't it? Why did you take the practice at all? Nowadays, that amount cannot fetch even tea and biscuit!" Dada then spoke out, "Money is needed even in observing religion. Nowadays religion is not possible without money."

(75)

This incident regarding Guru Maharaj has been narrated by a sincere kriya sadhak, who likes to keep himself anonymous -

Heard from Dada – Dada used to stay in the mountain then with Nangababa. Nangababa used to designate him as 'Bengali Bhoot.' Once Nangababa, while going out for some

specific work, entrusted the responsibility of other guru-brothers with Dada. Dada was extremely glad then, he was monitoring whereas the other gurubrothers were performing all work. Whenever he saw anybody sitting improperly, he hit him with a stiffened piece of wood and made him straight. Dada instructed the brother disciples to build a decorative bundle of leaves and stems at the entry of the cave of Vyaspith and inscribe on it, ‘Guru Kripahi Kevalam.’ When Nangababa returned, he was extremely glad to see the decorative bundle of leaves constructed at the advice of Dada.

Once, Nangababa took Dada and went into a deep forest; he said to Dada - “I will show you the process of leaving the mortal coil at the burial of a mahatma.” They reached a spot where Dada saw – one mahatma sitting in yogmudra in the state of absorption (samadhi) and several mahatmas sitting surrounding him, showing special obeisance to him. Slowly, the crown of the head of the mahatma sitting in the absorptive state started swelling and the other mahatmas started applying a paste of mountainous plants and herbs on the swollen part of the head. The swelling attained a big size and ruptured. There was bleeding from the site and then everybody buried him there. Nangababa said – “this is the process how a realized mahatma leaves his mortal coil in perfect yogic communion by rupture of the vertex of the head and then merges in transcendental Brahman.” When all the activities were over, the other mahatmas went off and only Nangababa and Dada were remaining. Nangababa said to Dada - “I am leaving, you sit in meditation here.” Henceforth Dada sat in meditation and entered into the depth of it. When he regained senses, he felt very cold. It was natural for such a mountainous region to be cold and he is quite accustomed to it but that day the severity of cold was virtually displacing him from the asana. Suddenly he felt that the asana was moving. Then he marked that the seat of his meditation was nothing other than a huge thick snake of the class of python. The asana started moving and with it Dada too, but nothing otherwise was visible due to pitch darkness. Dada said, “Then it was me and the snake; the snake mobile in its usual speed and I journeyed to the hut of Nangababa by a special procedure taught by him. I came and saw Nangababa in his hut and smiling.” Dada said regarding the livelihood in mountains - “It is very difficult for an aspirant to procure food and toil in the mountainous top compared to the plains because not all aspirants can survive on air. Hence a sadhu becomes very glad if a tourist gives him two dry chapatis in lieu of hundred rupees. But there are alternatives too for them who know it. The consumption of solidified milk of a she-yak, which drops down being excess, or the consumption of a few seeds of a fruit available in the dense forest of the mountains containing numerous seeds like poppy seeds, removes hunger, thirst or all sorts of tiredness for the next two or three days."

...to be continued

—Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Meditate on the form of the Satguru, take his word as gospel truth. Let the footfalls of the Satguru resound in the recesses of your heart. The Satguru is the Infinite, bow to Him. Think of the feet of the Satguru in your heart. By constant remembrance you will cross the ocean of illusive matter. Remember the Satguru within yourself and with the tongue repeat Sat-naam given by the Satguru. With your eyes visualize the form of the Satguru and with your ears hear the holy naam—the eternal song. **—Guru Nanak**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(12)

Employment in the railways:

Manicklal engaged himself in spiritual discussion regularly in the house of Mr. Herbert but, at the same time, his ancestral business, which he had started by the support of Raja Badridas, slowly waned and as a result Manicklal was plunged into intense poverty. He needed to have attention on his dresses because he had to keep in touch with the dignified Englishmen. Mr. Herbert had an idea that Manicklal's ancestral business was quite profitable. Anyway, after a few days, a railway job cracked. A position of supervisor became vacant in the booking office of East-India Railways at Park Street, Kolkata. Manicklal met Mr. P. C. Sheridon, the then traffic manager of the East-India railways with an intention of getting the job. Due to continuous interaction with the Englishmen, Manicklal's fear psychosis against the English people came to an end. The responsibility of the post was quite heavy. In those days, ticket booking for sea-faring steamers could be directly done in the railways. Many English couple of high post and English armies used to visit this office for ticket booking. If the supervisor could not understand their language or feelings or repeatedly utter, "beg your pardon" to try to clearly understand them, then they were ill-fated for disgraceful harassment and even physical assault. Hence, Mr. Sheridon explained the details of the responsibility of the post to Manicklal and then asked for his consent. Manicklal replied softly, "It will be mistaken if I say I can because no work is possible for me, until and unless the Almighty showers his blessings on my work." Such a comment declaring the possibility of failure in work is definitely harmful but as Mr. Sheridon was a religious-minded man, he could fathom the meaning of Manicklal's comment. He gracefully appointed Manicklal in the above job from 1.12.1912. He had to work hard for some time in that office with a fearful heart.

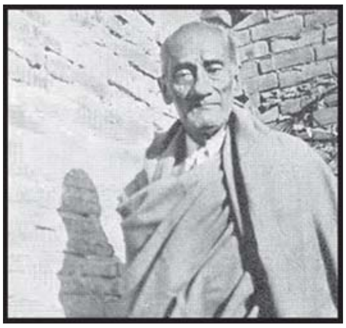

In the meantime, Manicklal's highly surprising and miraculous talk on God, his critical analysis of the scriptures spread widely among the wise and virtuous Englishmen of Bengal Club, Kolkata Club. Mr. F. G. Wigly was the chief secretary of the Bengal Government at that time. This old man used to visit the Park Street booking office on several evenings with a stick in hand in disguise. He used to keep his motor car at some distance from the booking office, ordered his body guards to stay there and then came to Manicklal. He used to request Manicklal for some religious talk in the midst of work. Manicklal was ignorant of the true identity of Mr. Wigly for a long time. Hence he felt him as an ordinary man and asked him to sit on a stool by his side with utter disrespect and tell a few religious talks to him at the end of the day, in the midst of his work. The old man never used to ventilate his identity. Very occasionally, Manicklal's father Shyamacharan Dutta used to visit the office. Noticing the old man by the side of his working son, he asked his son in mother language, "Why does the old man come to you regularly and disturb? You have such a responsible job, in case there is an error in counting money, you won't be

able to compensate the loss." The old man was never dejected. He sat by the side of Manicklal on a stool and listened happily to the religious talks.

One day, the old man expressed his desire of leaving India and going back to his country and requested Manicklal for his passage book. Considering the state of the old man that Manicklal was acquainted with, Manicklal asked his permission for third class ticket. In reply, the old man said, "Third class is ok, but what will be the fare for the first and second classes? As the old English lady, my wife, will be having her last journey from India, if I can afford, I will try to travel in the higher class." He left the place by saying that he will know in details the next day. Manicklal, later on, calculated the exact fares in all the three classes and showed it to the old man the next day. The old man said that he could manage the required amount and so passage book for the first class be made. Accordingly, Manicklal took money and made the passage book.

After a few days of this, Manicklal was confronted with a peculiar incident. An unknown English lady came to the booking office with a big motor-car, stepped elegantly to Manicklal and asked him to show the names of passengers for England so that she can identify whether any person known to her has a passage book. Manicklal handed over the list of names with great eagerness. The English lady examined the names of the passengers, exhibited a mental change and she angrily shouted at Manicklal, - "Nonsense, why have you not put 'Hon'ble Sir', before the name of F. G. Wigly. Don't you know he is the chief secretary of the Govt. of Bengal? Book my passage with him, in the same compartment." It was a bolt from the blue for Manicklal. The insult of the English lady didn't hurt him, he only thought in repentance how he disrespected Mr. Wigly. He gave him only a small stool to sit and miserly uttered him a few spiritual talks thinking that he had been so graceful to him. Now the only thought that haunted him was how to expiate at present. He made all arrangements for confirmed booking of the English lady and then Manicklal found out the address of Mr. Wigly. It was the practice of Manicklal to note down the address and phone numbers in some cases, of all the passengers, to avoid any error in passage booking. In the evening, Manicklal took the address of Mr. Wigly and reached the house with the intention of asking forgiveness. At the entrance, he was intercepted by the guards who didn't allow him to enter in despite repeated requests. Manicklal was strict in entering. In the meantime, Mr. Wigly identified Manicklal from the first floor of the house and came to him. He sincerely gave a cordial welcome and took him inside the house. The guards were also surprised at this. Manicklal entered into the room of Mr. Wigly and said, "Did you forgive me?" Mr. Wigly was astonished to hear this and said that there is no reason for forgiveness as he never noticed any mistake in the part of Manicklal. In reply to this, Manicklal spoke out submissively, "I gave you a small stool to sit, expressed only a few divine talks out of sheer negligence, but you are such a noble and spiritual person that you kept your identity concealed and only to fulfill the desire of hearing the divine talks, you have endured so much of hardship and humbleness. Hence I feel so guilty today. Kindly assure me that you have pardoned me from your heart."

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 11

The technique of restraining the mind – 4

Bhakta: My Lord! You are repeatedly asking me to grasp my mind or finding the faults of the mind, but who will get hold of the mind? I do not find anything apart from the mind.

Mahatma: My son! You have asked an excellent question. I will discuss the entire matter to you correctly. My son, you have to catch hold of your mind by your mind, henceforth this mind will find out the faults of your mind. Now I need to elucidate in details regarding this mind.

Bhakta: My Lord! How to catch hold of the mind by mind? This is a matter of great surprise!

Mahatma: My son! I have emphasized it long back that the matters pertaining to the mind are indeed surprising. Later on you can see several surprising matters of the mind. O mighty! Hundreds of instruments have been built to see the external world but nothing of the sort for analyzing the mind. The mind is the only instrument to observe the mind. The Brahmagyani Guru imparts Brahmavidya to the people and teaches to observe his inner world with the help of the vidya. The concentration power of the mind then moves inward and illuminates the psychology and analyses every part of the mind. As iron is cut by the sharp edge of iron, similarly hearing the discourses of the Guru and judgment imparted by the scriptures, renders the mind one pointed and sharp, which in turn wards off the mental desires. To explain, your mind which was lurking in ignorance, becomes oxidised by the germination of wisdom and this wise mind finally finds out its own faults and corrects itself. Mind itself is capable of whipping the mind, none else. Hence the ignorant mind has to be whipped by the wise mind. This is what is called, 'to catch hold of the mind by the mind.' Hence if you do not redeem the mind engrossed in worldly matter by the wisdom of the scriptures, there is no other alternative left. The mind-rope has to be cut by the mind and then the atman can be emancipated.

Mind is of two types – one pure and the other impure. Pure mind is the mind without desires and impure mind is filled with desires. The great sage Maharshi Vasistha had said to Ramachandra -

"*Man eva samarthasyad*
manaso driho nigrahe."
(*Yogavasistha*)

Meaning: mind itself can only cause annihilation of the mind, none else.

...to be continued
(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Forthcoming Events

Dol Purnima: 9th March, Monday
Spiritual Congregation: 22nd March, Sunday
Annapurna Puja: 1st April, Wednesday
Ram Navami: 2nd April, Thursday
Bengali New Year: 15th April, Tuesday. spiritual discourse by Sree Sree Maa in the evening.

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(33)

30th June

Dear Raja,

Note that the earthly individual (*jiva*) experiences the consequences of his own committed actions and at the source, there ultimately exists a Destiny which pervades and governs everything in the world. Even the trinity of the almighty lords *Brahma*, *Vishnu* and *Maheshwar* are subject to the control of this Destiny. In spite of this, the *jiva* can attain salvation through his own efforts and sincere endeavor. However, such effort, endeavor and the subsequent attainment of liberation, are eventually under the control of Destiny. The yogic seekers are thus advised to maintain a tranquil void in their minds by remaining free from passion, desire and longing for achievement and relinquishing ego in all its forms. Renouncement of the ownership of performed actions leads to the absolution from experiencing the consequences of such actions. The causal origin of the cycle of rebirths is seeded in these negative mental tendencies. When the mind is unshackled from such tendencies, it becomes comparable to a dried seed. As a dried seed completely loses it's potency towards the germination of a new plant, similarly, the tree of *samsara* (worldly creation) fails to sprout and spread its branches and stems from an impotent seed-like mind. The tree of worldly creation is rooted in delusive knowledge (*avidya*) or ignorance (*agyan*). Extraction of the root, naturally destroys the tree. While the root of the *samsara* tree is ignorance and passion, its trunks, branches and stems may be considered to be the tendencies of longing, egoism and consequent selfishness. By first axing-off the branches and stems, life-force of this tree gets reduced and restricted. Subsequently, it becomes easy to extract out the root itself.

You are already aware of these principles. You are also aware of the principles of right conduct and the nature of play of the force of *avidya*. Your mother may keep a copy of this letter.

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan

16th Poush, 1331 (Bengali),
Kashidham,

Dear Sarala – my utmost grace on you,

Your letters have reached me on time. Your *Sannyasini-Mata* (Monk-Mother) has written me two letters after she reached Haridwar.

She has started advising seekers in Haridwar. I feel very happy when your mother advises the people. I have undertaken the pledge of delivering earth-bound souls (*jiva*) and I have to accomplish this mission within a short span of time. This is why I get displeased when *Sannyasini* remains quiet, confining herself in the solitude of her home. All you devotees, carry on with your meditative penance and

contemplation with zeal and enthusiasm. Do not ever focus your attention towards the results delivered by your penance. The results or outcomes are controlled by God. Have faith that even a single appeal to God conducted with open-hearted simplicity, will never go in vain. What new advice will I offer you? You all have been continuing with your meditative practices for a long time now. You are aware of all meditative procedures and have received sufficient advice from your Guru. I understand that you have to carry the burden of familial duties and responsibilities, but do not waste whatever free time you get in between—utilize such time in meditative contemplation. Such sincerity pleases God and He will take charge of the duties on your behalf. You all have received ample grace from God; effectively utilize such grace and never misuse it.

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan

3rd Falgun

Dear Sarala – my utmost grace on you,

Comprehend *samsara* (worldly relations and attachments) as the unending source of grief and suffering, and make an all-round endeavor so that you do not have to again take refuge of this mortal coil in rebirth. How so much be the extremity of distress delivered by *samsara*, it withers away completely when the mind is detached from it. Desire and longing, distractive and authoritative tendencies, and passion for worldly enjoyment, are the innate characteristics of the mind. Freedom from these tendencies naturally leads to the dissolution of the *samsara*—for this is what essentially *samsara* is, in its subtle sense. Perceive and fathom that husband, sons or daughters are not your original eternal relations and thereby absolve our mind from desires and authoritativeness—*samsara* will be renounced forever.

The only reality in this world is *Brahman*, expressed as Divine Consciousness. This Consciousness mingles with ego and appears in the inner-sky as different embodied forms—I, you, him etc. The *Brahman* is attained when one is liberated from the false perception of lower individualistic ego. This Divine Consciousness is the real Self—nothing else.

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan

5th Chaitra,
Kashidham,

Dear Geeta – my utmost grace on you,

Your postcard has reached me yesterday. You have requested for advice on mechanisms of proper conduct in *samsara*, as you have been placed in the path of *samsara*-hood.

One has to relinquish selfishness. Serve and take care of the older members of the family and treat the younger ones as your own. Accomplish the duties assigned to you with utmost sincerity. Do not indulge in disputes or quarrels with anybody. Do not point-out faults that you observe with anybody. Let others judge and resolve such faults. Always remain calm, serene and blissful. Acknowledge and admit to the elderly members whenever you commit a mistake. Meditate a little in solitude. My grace remains with you.

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan

...to be continued

(*From the book titled "Brihat Kishori Bhagavat" by Sree Sree Maa Sharbani*)
—Translated into English by Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

Mata Sharbani Trust
Annual Report (2018-2019)

The vision of Mata Sharbani Trust is based on the ideals of its principal and patron, Sree Sree Maa Sharbani who, in the spirit of highest universal values, has charted a path that combines realization of supreme truth with service to humanity. The goals of the Trust cover humanitarian, spiritual and cultural aspects in an attempt to serve people, irrespective of gender, caste, creed, religion or race and spread the message of unity and eternal Truth. Preserving our prized heritage and reviving them in the modern age, providing relief to the needy and poor, assisting people with educational and medical support, helping destitute homes and educational institutions, etc., form some of the core activities of the Trust. Spreading the message of unity of spiritual paths, practice of Brahmavidya as a means to attain self-realization, publication of books / CDs/ cassettes on Indological themes, study of Sanskrit and practice of music through regular sessions, teaching of yoga as a means for good health, dissemination of knowledge through maintenance of a library of rare books, holding of cultural events on Indological themes, regular spiritual discourses on auspicious occasions, detailed studies on our scriptures to appreciate its true meaning for self-realization and service, satsang with saints and sadhus, distribution of relief materials including clothes, blankets, food and medicine to the poor, educational support for the needy, providing drinking water facilities and other infrastructural support for development of adjoining rural areas, rendering support to similar organizations working especially for the well-being of forsaken women and orphaned children, are some of the regular activities of our Trust. The Trust carries out its activities through its main centre at Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing Shibrampur and auxiliary centres in Varanasi, Puri, Nabadwip and through another organization, Sarada-Ramakrishna (Shishu O Mahila) Sevashram, an orphanage cum residential school in the village of Marjada (Hotor), located on the outskirts of the city of Kolkata. The main centre at Akhanda Mahapeeth also has a Self-Realization Centre-cum-Cultural Complex inside the main Trust premises and the Bhakta Nivas and Annapurna Kshetra inside Plaza Housing locality of Shibrampur. We highlight below some of the important activities that were carried out during the period April 2018 to March 2019.

Several charitable activities were carried out from the main Ashram premises of the Trust at Akhanda Mahapeeth, Shibrampur. Like every year, more than 1000 poor people were donated new clothes and food packets during two sessions, one prior to Durga Puja and one before Kali Puja. These included sarees for women and dhotis / lungis for men and dresses for children. It also included dresses for children and infants who came with their parents. Later in December, more than 300 woollen blankets were donated to the needy people of the region. Education aid and Medical aid was given to several people during the year. During the Navratri festival, 'bhandara' was organized on several days and food was distributed for people of the locality. During the Annapurna festival, children of the locality were especially

provided food, served by Sree Sree Maa herself. During the anniversary of enthronement of the Guru Maharajas, 'bhandara' was held for all and a special food arrangement was made for the children of Aikyatan School of the vicinity. Several ongoing social services in the locality were continued. In addition, regular road refurbishing has been carried out to enable people of the region to have better access from the main road to their homes. Infrastructure was improved in the main Ashram premises during this period. The marble fixing work on the outer walls has progressed to almost completion and the next phase is being planned. Bhakta Niwas was renovated and painted. Several charitable and spiritual activities are carried out from the premises of Bhakta Niwas / Annapurna Kshetra.

The following activities were carried out for the Hotor Sevashram – Classes were smoothly continued for the Sarada Shiksha Mandir, the Pre-primary and Primary school run by the Sevashram. For this, renovation of dormitory rooms, school rooms and Sevashram building were taken up. Copy books, pens and pencils were provided for the school children and facilitated through the Trust. In addition, regular ration supplies of nutritious food, clothes, regular usage items and educational material, including text books, were provided for the resident children. Several devotees of the Trust have regularly visited the Sevashram on a weekly basis to provide services, especially to teach the children studying in the Sevashram School to help improve their academic performance. Results have been very encouraging. Renovation works were continued out in the Nabadwip Ashram of the Trust. Regular maintenance of the Ashram was carried out and maintained. Water supply from the Municipality was obtained. As part of charitable activities, a cemented road was constructed in the area near the Nabadwip Ashram premised, which is of great value for comfortable transport for the local people, mostly from lower income background. Sree Sree Maa and other devotees visited the Varanasi, Puri and Nabadwip Ashrams and carried out charitable activities like sadhu seva.

Many other activities that form part of the core objectives of the trust were carried out with full fervor. Several publications were made from the Trust during the year. These include a Bengali book 'Ritachhanda' by Sree Sree Maa. Four issues of the quarterly journal Hiranyagarbha were published. The Ashram website was redeveloped and a You Tube Channel was started for the benefit of devotees. Yoga classes and teaching of Sanskrit texts were held regularly. The invaluable spiritual library, containing more than 2000 books, was functional throughout the year. Several new books have been added to the library in the last year. The bi-weekly discourse on the Bhagwat Gita by Dr Barun Dutta was continued every alternate Sunday morning. More than hundred sessions are already completed. The other extremely valuable feature is the monthly class on Patanjali Yogasutras conducted by Sree Sree Maa herself, especially for women sadhikas. Sree Sree Maa continued with her Saturday evening music classes on a regular basis. Several new songs were composed by her and some devotees during this period. The Ashram holds four Spiritual Discourses every year on topics of interest. Four sessions were delivered by Dr Barun Dutta, focusing on the Katha Upanishad in particular. Lectures on spirituality with special emphasis on Kriya Yoga was initiated and delivered by Sree Sree Maa herself where she not only spoke on key principles and methods but also answered questions from the audience.

A number of events were held highlighting Indian culture. These included regular programmes by devotees during various special occasions. Several eminent people performed in the Ashram premises to highlight various aspects of Indian culture. These included sangeet recitals by Smt Priyanka Chattopadhyay, Shri Subrata Sengupta and Paripurna Devi (disciple daughter of Sri Abhayji), dance programmes by the members and pupils of Guru Giridhari Nayak of Odishi Ashram, and several music and dance programmes by Hotor Sevashram children and Akhanda Mahapeeth Ashram devotees, etc. Mahatma Sri Sri Taat Baba of Pushkar visited our Ashram. Shri Imtiaz Ali Jonab, also visited the Ashram. Sree Sree Maa alongwith some disciples visited the ashram of Sri Madavanandaji at Konnagar. A Satsang was held at Akhanda Mahapeeth on the visit of Swami Chetanananda Giri Maharaj, a sadhu in the lineage of Paramhansa Yogananda. Sree Sree Maa also visited the Varanasi, Nabadwip and Puri Ashrams. In Puri, Sree Sree Maa met with Swami Jitomohananda-ji of Divine Life Society. Sri Narayandas Baba of Devraha Baba Ashram visited Varanasi Ashram and met with Sree Sree Maa. Swami Shri Gurudas Ashram frequently visited Varanasi Ashram to maintain the activities there. Sree Sree Maa along with a few Ashramites visited 'Hotor Ashram' on their annual programme. Sadhvi Suchetanandamoyee and Shadhvi Punyanandamoyee welcomed Sree Sree Maa through arati and garlanding. The students and brahmacharinis of the Ashram also paid their homage to Sree Sree Maa. The children of the Ashram performed a beautiful cultural programme. Sree Sree Maa along with a few Ashramites visited 'Yogoda Satsang Society' at their Dakshineshwar Ashram and a Satsang was held in the presence of Swami Shuddhananda and other monks of the Yogoda Satsang Society. They also showed everyone rare glimpses of heritage items of Swami Yogananda. Swami Bhedatitananda of Ramakrishna Mission and Swami Subharupananda of Bharat Sevashram Sangha visited Akhanda Mahapeeth on the occasion of Durga puja. We also remember with deep sorrow Swami Rajeshwarananda-ji and his last visit during this period, after which he passed away.

Dance programme by the pupils of Guru Giridhari Nayak, at Ahanda Mahapeeth

Shri Raj Kumar Daga, Chartered Accountant, has given his consent to re-appointment as Auditor. The Trust accounts for financial year were audited by Shri Raj Kumar Daga and duly approved by the Trustees.

With the grace and guidance of the Supreme Divine, Sree Sree Maa, all patrons and well-wishers, we hope to continue serving mankind with dedication and devotion. We express our sincere thanks and gratitude to all donors, devotees and volunteers for their help, dedication and selfless efforts in helping our mission to succeed. We feel blessed to have received this unique opportunity to serve. We pray for the well-being of all.

-Shri Siddhartha Nandi & Swami Sadasivananda,
Trustees and Joint Secretaries, Mata Sharbani Trust
Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing (Jagannathpur) Shibrampur, 24 Parganas (S),
West Bengal 700141, India. *November 10, 2019*

News in Brief

29th September - 4th October - The 28th Navaratri Durga Puja was organized at the Ashram premises. On Panchami in the morning, Sree Sree Maa distributed clothes, sweets and biscuit packets to around 580 villagers. An absorbing cultural programme was conducted in the evening where a dance recital was presented by the pupils of Sri Giridhari Nayak. The earlier

issue of Hiranyagarbha was released on this evening. In the evening on Saptami, a cultural programme constituting of bhajans and dance was conducted. On Mahastami, a bhandara was organized on the holy occasion of the death anniversary of Sri Lahiri Mahasaya. On Navami, mahaprasad of Sri Sri Durga Devi was distributed. Swami Purnabrahmanandaji and Bhedatitanandaji from Ramkrishna Mission, Swami Ekatmanandaji from Bharatsevashram and Swami Chetanandaji of the Paramahansa Yogananda order, visited the Ashram during these days.

1st - 19th October - Sri Sri Taat Baba of Pushkar spent these days at the Ashram.

13th October - On the occasion of Sree Sree Kojagari Purnima, Sri Yajnanarayan-da performed the puja of Sri Sri Lakshmi Janardanjiu at Sree Annapurna Kshetra. After puja, yajna was held at the Ashram.

20th October - In the morning, Sree Sree Maa distributed clothes to more than 500 villagers. The villagers were also offered sweets and biscuits.

27th October - At midnight, Sree Sree Maa performed the puja of Maa Devi Tarakalika at the Ashram.

5th November - On the occasion of Sri Sri Jagaddhatri Puja, prasad was offered at the Annapurna Kshetra.

10th November - The Annual General Meeting of Mata Sharbani Trust was held in the evening at the Ashram premises.

12th November - On the occasion of Raas Purnima, offerings were made to Sri Sri Radha Madhav followed by distribution of prasad. In the evening, Sree Sree Maa herself presented some beautiful bhajans.

14th-15th November - Sree Sree Maa along with a few disciples visited Ramdewra in Rajasthan to visit the temple of Sri Sri Ramdewra Baba.

1st December - On this day, warm blankets and winter wear were distributed among many poor villagers in the locality.

4th - 5th December - Worship of Sree Annapurna Mata and Sri Vishweshwar Shiva was conducted on 4th December. A program of bhajans by Smt. Laboni Lahiri was conducted in the evening at Annapurna Kshetra. On 5th morning, worship of Sree Lakshmi Janardanjiu was held and prasad was distributed.

8th - 18th December - Sree Sree Maa along with a few disciples spent these days in Varanasi. During her stay, Sree Sree Maa visited Sri Pawhari Baba's Ashram in Gazipur and met Sri Hans Baba and Sri Naranayandas Baba at Sri Devraha Baba's Ashram. Maa also visited Bodh Gaya during her return to Kolkata.

25th December - On the 33rd session of the 'Adhyatmik Sabha', our brother disciple Dr. Barun Dutta commenced his discourse on the Prashna Upanishads.

29th December - On this morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on Kriyayoga.

30th December - 2nd January - Sree Sree Maa visited Deoghar along with a few disciples.

5th January - In the evening, a cultural programme was conducted by the pupils of the Hotor Ashram.

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. ....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : ....
2. Address : ....

....

....

3. Phone No. 1................................ 2................................ Email : ....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : .... To (Date) : ....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. ....

....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust")..

....

7. Checked by (Name) : ....

Signature :..Date :......................................

Publication List 1